কুরআন ও সুন্নাহর পতাকাতলে
ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন আমাদের নিরন্তর প্রয়াস

১০ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৩

স্মরণিকা

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

www.shubbanbd.org

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

প্রোপাইটর:
মোঃ আব্দুল্লাহেল ওয়াহিদ
০১৭১৩-১১৮৬২৪

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্ব, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

SHT
Salmat Hajj Travels & Tours

সালামত হজ্ব ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস

হজ্ব লাইসেন্স নং-১১৫৫

ঢাকা অফিস: সুইট: ৩০৫/বি, বাইতুল খায়ের (৪র্থ তলা),
৪৮/এবি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৯৫৮৫৭১৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কুরআন ও সুন্নাহর পতাকাতলে
ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন আমাদের নিরন্তর প্রয়াস

১০ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৩

স্মরণিকা

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

স্মরণিকা
১০ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৩

উপদেষ্টা	:	ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক রবিউল ইসলাম
সম্পাদক	:	আব্দুল মতিন
সম্পাদনা সহকারী	:	ইমাম হাসান মাদানী হাফেয আশিক বিন আশরাফ তাওহীদ বিন হেলাল মাহদী হাসান মুহাম্মাদ
ব্যবস্থাপনা	:	দেলোয়ার হোসেন হেদায়েতুল্লাহ
প্রকাশনায়	:	প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
প্রকাশকাল	:	১০ মুহররম, ১৪৪৫ হিজরি ২৯ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ ১৪ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
অঙ্গসজ্জা	:	মোঃ রায়হান উদ্দিন
মুদ্রণ	:	পিক্সেল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টার্স ৫১/৫১/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা ০১৭৫৭-৬৭২৬৯৬

সূচিপত্র

০১. বাণী
- ❖ জমঈয়ত সভাপতি ---- ০৪
- ❖ জমঈয়ত সেক্রেটারি জেনারেল ---- ০৫
- ❖ উদ্বোধক (দাওয়াহ্ অধিবেশন) ---- ০৬
- ❖ উদ্বোধক (সাংগঠনিক অধিবেশন) ---- ০৭
- ❖ প্রথম আহ্বায়ক ---- ০৮
- ❖ কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি ---- ০৯

০২. সম্পাদকীয় ---- ১০

০৩. দারসুল কুরআন ---- ১১

০৪. দারসুল হাদীস ---- ১৬

০৫. শুব্বানের পাঁচদফা কর্মসূচি
- ❖ **১ম দফা- আক্বীদাহ্ সংশোধন :** সকল সংশোধনের সূচনা ---- ২১
- ❖ **২য় দফা- আদ্-দা'ওয়াহ্ ওয়াত তাবলীগ বা আহ্বান ও প্রচার :** আমাদের দা'ওয়াহ্ ---- ২৮
- ❖ **৩য় দফা- আত্ তানযীম বা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা :** সংগঠন ব্যবস্থাপনার পথ ও পদ্ধতি ৩৬
- ❖ **৪র্থ দফা- আত-তাদরীব ওয়াত্ তারবিয়্যাহ্ :** আপডেট কর্মী গঠনের পূর্বশর্ত ---- ৪৮
- ❖ **৫ম দফা- সমাজ সংস্কারের রূপরেখা:** ইসলামী নির্দেশনা ---- ৫২

০৬. **শুব্বানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (আরবি)**-আব্দুল মতিন ---- ৫৭
الموجز في معرفة جمعية شبان أهل الحديث ببنغلاديش

০৭. **শুব্বানের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ** ---- ৬৩

০৮. **সুপ্রিয় শুব্বান! সংগ্রামটা চালিয়ে যান**- অধ্যাপক মুহাম্মাদ আসাদুল ইসলাম ---- ৬৪

০৯. **শুব্বানের সূচনায় বংশাল বড় মাসজিদ**- আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর ---- ৬৭

১০. **বংশাল বড় মসজিদ থেকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন: প্রাপ্তি, প্রত্যাশা ও চ্যালেঞ্জ**- ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ ---- ৬৯

১১. **যুগে যুগে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের আত্মত্যাগ**- ড. এ এস এম আজিজুল্লাহ ---- ৭৫

১২. **ইসলামী সংগঠনগুলোর ঐক্যের অন্তরায় :** দূরীকরণের কিছু উপায়- প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী ---- ৮২

১৩. **কর্মীর চোখে শুব্বান**- মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক ---- ৮৬

১৪. **মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও আল-কুরআন**- ড. ইমতিয়াযুল আলম মাহফুয ---- ৯৩

১৫. **জীবনগতির স্বর্ণবাণী ও দর্শন**- তাওহীদ বিন হেলাল ---- ১০০

১৬. **স্মৃতিতে এক আলোকবর্তিকা: প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামছুর রহমান**- মো.আরিফুর রহমান ---- ১০৬

১৭. **শুব্বানের অগ্রযাত্রায় মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া**- মাহদী হাসান মুহাম্মাদ ---- ১১৪

১৮. **'শেসাসের'-এর গোড়াপত্তন ও কিছু কথা**- মোঃ আব্দুল হাই ---- ১১৭

১৯. সাংগঠনিক প্রতিবেদন: ৯ম সেশন ---- ১২১

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
সভাপতি
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতির বাণী

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمابعد.

তাওহীদবাদী যুব ও ছাত্র সমাজের প্রাণপ্রিয় সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের দ্বি-বার্ষিক কেন্দ্রীয় সম্মেলনের শুভক্ষণ সমাগত। এই সম্মেলনকে ঘিরে দেশব্যাপী শুব্বান নেতাকর্মীদের দিবানিশি কর্মতৎপরতা লক্ষণীয়। গঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আগামী সেশনের জন্য নেতৃত্ব নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিষদ মাজলিসে আম-এর সকল সদস্য নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন। তারা সাংগঠনিকভাবে যোগ্য ও দক্ষ; কিন্তু নেতৃত্বের প্রতি নির্মোহ। আম সদস্যগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়েছে এই সেশনের নেতৃত্ব।

কাউন্সিলকে কেন্দ্র করে শুব্বান নেতা-কর্মীদের মাঝে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করলেও নেই কোনো লবিং গ্রুপিং কিংবা অপকৌশলে নেতৃত্ব লাভের অপচেষ্টা। কারণ, তারা প্রত্যেকেই নিবেদিত, নিষ্ঠাবান আর ভালো করেই জানেন যে, নেতৃত্ব একটি আমানত। আর এই আমানত রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব।

আমাদের এই অঙ্গ সংগঠনে যে কেউ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন না; বরং একজন কর্মীকে চারটি ধাপ অতিক্রম করতে হয় এবং প্রতিটি ধাপে নির্ধারিত সিলেবাস সমাপ্ত করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এছাড়াও প্রতিটি ধাপে সংগঠনের জন্য ত্যাগ-তিতীক্ষার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে সালেহ মানে উন্নীত হতে হয়। এরপর তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগের যোগ্যতা অর্জন করেন।

তাদের এই নির্বাচন প্রক্রিয়াটি দেশের সকল স্তরে অনুসৃত হলে সর্বসাধারণ নেতৃত্বের প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল হতো, অপরদিকে সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করত। এই সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাদের জন্য আমার শুভকামনা ও নেক দোয়া সর্বক্ষণ।

সম্মেলনকে উপলক্ষ করে এবারও শুব্বানের মেধাবী তরুণদের সৃষ্টিশীল প্রয়াসে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে; যাতে তাদের বিগত দুই বছরের অর্জন চিত্রায়িত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, তাদের এই অর্জন ভবিষ্যত শুব্বানদের জন্য একটি মাইলফলক হবে।

আমি মহান আল্লাহর নিকট প্রাণোৎসারিত দু'আ করি আল্লাহ তাআলা তাদের সম্মেলন ও আগামীর নেতৃত্বকে কবুল করুন। আমীন।

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
সেক্রেটারী জেনারেল
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

BANGLADESH JAMIYAT AHL-AL-HADITH, ESTD-1946

মাননীয় জমঈয়ত সেক্রেটারি জেনারেলের বাণী

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর একমাত্র যুবসংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর ১০ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন আগামী ২৯/০৭/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সম্মেলনের মুখপত্র হিসেবে স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে শুনে খুশি হলাম।

মানব জাতির বড় শক্তি যুবসমাজ, কিন্তু এ শক্তি অপাত্রেও ব্যবহৃত হতে পারে। তখন তারা জাতির শক্তি নয়; বরং জাতি বিনষ্টের হাতিয়ারে পরিণত হয়। এ জন্য ইসলাম যুবসমাজের যৌবনকালকে সঠিক পন্থায় ব্যবহারের জন্য অনেক নির্দেশনা, উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : شَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ -যে যুবক তার যৌবনকাল আল্লাহর নির্দেশনা ও আনুগত্যে অতিবাহিত করে, কিয়ামতের বিভীষিকাময় দিবসে সে যুবক আল্লাহর আরশের ছায়াতলে শান্তির আশ্রয় লাভ করবে। এ হলো পরকালীন সফলতা। এমন যুবকরা পার্থিব সফলতাও নিশ্চিত করতে পারে। এ লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

বিশেষ করে বর্তমান বিশ্বে মুসলিম যুবকরাই হলো সকল অপশক্তির টার্গেট, কীভাবে তাদেরকে আদর্শ বিচ্যুত করা যায়। কাউকে অশ্লীলতার মাধ্যমে, অথবা কাউকে ধর্মীয়বেশে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে দিয়ে। এমনি প্রেক্ষাপটে যুবসমাজকে ইসলামী মহান আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রাখতে বড় ভূমিকা রাখবে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ। ১০ম কেন্দ্রীয় সম্মেলনে নতুন দায়িত্বশীলগণ নতুন উদ্যোমে সেলক্ষ্যে এগিয়ে যাবে- এ প্রত্যাশাই আমাদের।

আজকের শুব্বান আগামী দিনের জমঈয়ত। এতেই শুব্বানের সফলতা ও জমঈয়তের সার্থকতা। এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার। আল্লাহ্ কবুল করুন, তাওফীক দান করুন। ১০ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন সফল হোক।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

আলহাজ্জ এম. এ. সবুর
উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ও চেয়ারম্যান, মাসকো গ্রুপ।

মাননীয় উদ্বোধকের বাণী
(দাওয়াহ অধিবেশন)

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার। সালাম ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.), তাঁর পরিবারসহ সকল সাহাবী (রা.)-এর উপর।

তরুণ ও যুবসমাজই আমাদের দেশের সম্পদ, তারাই আমাদের জাতির কর্ণধার, তারাই আমাদের শক্তির উৎস। তারা সঠিক পথে পরিচালিত হলে দেশ সঠিক পথে পরিচালিত হয়। আর এ তরুণ শক্তিকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে, তাদের মাঝে ইসলামের বিশুদ্ধ বাণী ছড়িয়ে দিতে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের অঙ্গসংগঠন হিসেবে আমাদের প্রিয় সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

একটি দীনী সংগঠনের মূল কাজ হলো দাওয়াতী কাজ। এই কাজে শুব্বানের নেতা-কর্মীরা আন্তরিকতার সাথেই কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছেন বলে আমার বিশ্বাস। তবে এ কাজে আধুনিক পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করে সর্বত্র দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। তবেই আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ পরিপূর্ণরূপে পালিত হবে।

কাউন্সিলের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব আসে, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের গতিকে আরো তরান্বিত করে। অতীতে যারা এই কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং যারা নতুনভাবে দায়িত্ব পেলেন তাদেরকেও অভিনন্দন জানাই।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, এ ১০ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি মূল্যবান স্মরণিকা প্রকাশ পেয়েছে। এ স্মরণিকা প্রকাশে যারা সময়, চেষ্টা ও শ্রম দিয়েছেন তাদের প্রয়াস সফল ও সার্থক হোক এবং মহান আল্লাহ তাদের খেদমত কবুল করুন।

আলহাজ্জ এম. এ. সবুর

কাজী আকরাম উদ্দীন আহমেদ
উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ও চেয়ারম্যান, ট্রাস্টি বোর্ড,
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি এন্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ।

মাননীয় উদ্বোধকের বাণী
(সাংগঠনিক অধিবেশন)

মহান আল্লাহ্‌র জন্য সকল প্রশংসা এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবীর ওপর।

দেশে অনেক তরুণ ও যুবকদের সংগঠন রয়েছে। তবে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ একটি ব্যতিক্রমী সংগঠন। কারণ, তাদের দাওয়াত-তাবলীগ ও সাংগঠনিক ভিত্তির উৎস হচ্ছে কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্, যা তাদেরকে অন্য সংগঠনগুলো থেকে আলাদা করেছে। জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ আমাদের নিকট একটি আদর্শের নাম, একটি তাওহীদী কাফেলার নাম। তারা বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ছায়াতলে একত্রিত হয়ে দেশের ছাত্র ও যুবসমাজের নিকট হেরার বাণী প্রচারে কাজ করে যাচ্ছে। আজ এই আলোকিত সংগঠনের দশম কেন্দ্রীয় সম্মেলন। এ সম্মেলনে আমি উপস্থিত থাকতে পেরে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। কারণ এ সম্মেলন ইসলামী তরুণ সম্মেলন। কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের সম্মেলন। তারুণ্যের কাছে গেলে নিজের সেই বয়সকে মনে পড়ে। তারুণ্যের পাশে থাকলে উদ্দীপনা বাড়ে।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকার জন্যও আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ এটা মানুষের কর্মকে ধরে রাখার একটি সৃজনশীল মাধ্যম।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে এ সম্মেলনে আগতে সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সুস্থ-সুন্দর পরিলীলিত জীবন পরিচালনা করার তাওফীক দিন। আমীন।

কাজী আকরাম উদ্দীন আহমেদ

মোঃ মনিরুল ইসলাম
প্রথম আহ্বায়ক, কেন্দ্রীয় কমিটি
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

শুব্বানের প্রথম আহ্বায়কের বাণী

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে তাঁরই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। দরুদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্ব শান্তির অগ্রদুত মানবতার মহান শিক্ষক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ ও পুণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ঐসব মর্দে মুজাহিদদের যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিঃস্বার্থ কুরবানীর ফলে দ্বীনী কাফেলা এগিয়ে চলছে আপন লক্ষ্যপানে।

২৬ ডিসেম্বর ১৯৮৯ সাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সুযোগ্য সভাপতি আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী স্যারের নির্দেশক্রমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকার নিউ ইস্কাটন বাসায় এলে জমঈয়তের যুবকদের সংগঠনের নাম কী হবে তা নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে ২৭ শে ডিসেম্বর বাদ এশা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৮ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় বংশাল মসজিদের ২য় তলায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত সম্মানিত মুরব্বী ও তরুণদের নিয়ে কনভেনশন অনুষ্ঠান হয়। যেখানে বক্তব্য রাখেন আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী, প্রফেসর একেএম শামছুল আলম, শাইখ আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ হুসাইন, আলহাজ্ব আব্দুল ওয়াহ্হাব, অধ্যাপক হাসানুয্ যামান, অধ্যাপক আব্দুল ওয়াহাব লাবীব, অধ্যাপক এ,এইচ,এম শামসুর রহমান, অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গয্নফর, অধ্যাপক মুবারক আলী, ড. আযহার উদ্দীন-সহ আরো আনেকে...

দু'-কলম লিখতে যেয়ে বার বার মনে পড়ছে, বংশাল মসজিদে শুব্বান প্রতিষ্ঠার সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের কথা, মনে পড়ছে আল্লামা ড. আব্দুল বারীর দরদমাখা সেই কথা- 'মুনীর' তোমাকে আজ নিতে হবে শুব্বানের দায়িত্ব। সেই দিনটা ছিল ২৮ শে ডিসেম্বর ১৯৮৯ সাল বাদ এশা। সেই সময় থেকেই শুরু হলো শুব্বানের পথ চলা। যার রাগ-অনুরাগ, স্নেহ-ভালবাসা, উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগপৎ পরামর্শে অনেক সমস্যা সংকুলান পথ মাড়িয়েছে। তিনি আজ আমাদের মাঝে থাকলে হয়তো সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন-আমীন।

আমার প্রাণপ্রিয় সংগঠন জমঈয়ত শুববানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর ১০ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৩ আজ শনিবার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন রমনা, ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইন-শা-আল্লাহ্। উক্ত সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ পাচ্ছে। এ জন্য আমি অত্যন্ত খুশি। এই স্মরণিকা এবং সম্মেলন করতে যেয়ে যারা মেধা, শ্রম, নির্দেশনা, পরামর্শ, শ্রমে-ঘামে আর্থিক সহায়তা করেছেন পরম করুণাময় তাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন-আমীন।

পরিশেষে বলতে চাই, শুব্বানের সূচনালগ্ন হতে জমঈয়ত সভাপতি আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী রাহিমাহুল্লাহসহ জমঈয়তের যেসকল মুরুব্বীয়ানরা সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, যারা আজ আমাদের মাঝে নেই, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন-আমীন।

মোঃ মনিরুল ইসলাম

ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী
সভাপতি
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

শুব্বান সভাপতির বাণী

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, দরুদ ও সালাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি, যাকে দয়াময় আল্লাহ্ বাশির ও নাযির করে এ জগতে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। যিনি মহান প্রভুর নির্দেশনাকে 'হিকমাহ্' দিয়ে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে আমাদের জন্য মডেল উপস্থাপন করে গেছেন।

প্রকৃতপক্ষে আমরা মহাকালের মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত দুনিয়াতে অবস্থান করি। আখেরাতে মানুষের উপলব্ধি মতে, আমরা মাত্র এক সকাল বা বিকেল পরিমাণ সময় দুনিয়ার পরীক্ষা কেন্দ্রে অবস্থান করি। এই সামান্য সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তের কার্যকর ব্যবহারের উপরই প্রতিনিয়ত আমাদের অসীম সময়ের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে। আর অসীম সময়ের সৌভাগ্য নির্ধারণের জন্যই জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য ১৯৮৯ সাল হতে অদ্যাবধি যুবক ও তরুণদের মাঝে কাজ করে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত জীবনে সফলতার পাশাপাশি বৃহত্তর সংগঠন জমঈয়তের নেতৃত্বেও অবদান রাখছে।

দেশব্যাপী বিভিন্ন জেলায় শুব্বানের ভাইয়েরা, মজলিসে আম ও দায়িত্বশীলবৃন্দ, শাখা পর্যায়ের কর্মী ও দায়িত্বশীল, শেকড়, শুব্বান রিসার্চ সেন্টার এবং আশ শিফা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র-এর সদস্যবৃন্দ শ্রম দিয়ে শুব্বানকে একটি আদর্শ সংগঠন হিসেবে গড়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। সেইসব ভাইদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। সেইসাথে ১০ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন-২০২৩-এর কর্মী, সদস্য, পৃষ্ঠপোষক এবং শুভানুধ্যায়ী সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আগামী দিনের সৎ, যোগ্য ও আদর্শ নেতৃত্বের মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ। আসুন সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও সকল ধরনের নেশাকে নির্মূল করে আগামী দিনে আদর্শ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে শুব্বানের কাফেলায় শরীক হই। সমাজ হতে শিরক-বিদআত নির্মূল করি।

পরিশেষে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বারগাহে প্রার্থনা হে প্রভূ! তোমার মনোনীত দ্বীনের খাদিমদেরকে হিফাযত কর! তোমার দ্বীনের ষড়যন্ত্রকারীদের সকল পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দাও এবং তোমার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মেহনতী মুখলেস বান্দাদেরকে তুমি কবুল করো-আমীন।

ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী

আব্দুল মতিন
শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক, যুগ্ম-পরিচালক
শুব্বান রিসার্চ সেন্টার ও প্রধান, স্মরণিকা প্রকাশ কমিটি

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'আলার। দরুদ ও সালাম বর্ষিক হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.), তাঁর আহলে বাইত, সকল সাহাবী ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন তাঁদের সকলের উপর।

কল্পনা শক্তিকে একটু কাজে লাগিয়ে ফিরে যাচ্ছি ২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের বংশাল বড় জামে মসজিদ চত্বরে। যেখানে আল্লামা ডক্টর আব্দুল বারী রহ. দেশের ছাত্র ও যুবসমাজকে বিশুদ্ধ দ্বীনের পথে পরিচালিত করতে তাওহীদের মশাল তুলে দিলেন মুহতারাম মোঃ মনিরুল ইসলামের হাতে। এরপর একে একে হাত বদল হয়ে এসে পড়ে মুহ্তারাম ইসহাক বিন এরশাদ মাদানীর হাতে।

অতঃপর তাঁরও সময় শেষ, গন্তব্য চলে এসেছে, নামতে হবে, জায়গা করে দিতে হবে নবীনদের। তাইতো আজ ২৯ জুলাই ২০২৩ এ ইঞ্জিনিয়ারস ইন্সটিটিউশনে শুব্বানের ১০ম সম্মেলন। এবার নতুনকে বরণ করার পালা। এ সম্মেলনকে স্মরণীয়-বরণীয় করতে, উপদেশ-পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনার মধ্য দিয়ে রঙিন অক্ষরে রঙিন পাতায় একে স্মরণীয় রাখতে একটি "স্মরণিকা" প্রকাশ পেয়েছে, আল-হামদুলিল্লাহ্।

স্মরণিকায় কোন্ কোন্ লেখা স্থান পাবে, যা শুব্বানের নেতাকর্মীদের খোরাক যোগাবে, সংগঠনের পথ চলায় সহযোগী হবে- এমন অনেক শিরোনাম নির্বাচন করে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ লেখকদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। আবার লেখার আহ্বান জানিয়ে সাধারণভাবে প্রচারণাও চালানো হয়। এর প্রেক্ষিতে বিষয়ভিত্তিক লেখা প্রেরণ করে সম্মানিত লেখকগণ আমাদেরকে ধন্য করেছেন।

যাঁরা বাণী দিয়ে, মূল্যবান লেখা দিয়ে এ স্মরণিকার রওনক ও রওশনকে বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পাশাপাশি জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা! এছাড়াও মহান আল্লাহর কাছে উত্তম বিনিময় কামনা করছি। তবে যাঁদের লেখাগুলোকে স্থান দিতে পারিনি, তাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি।

সময় স্বল্পতার কারণে এবং নির্ধারিত সময়ের পরে, আবার একবারে শেষ মুহূর্তে অনেক লেখা এসে পৌঁছায়, যথাযথ মুরাজা'আহ্ সম্পন্ন না হওয়ার ফলে এটি ত্রুটিযুক্ত থাকবে এটাই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে- এ জন্য ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো।

শুব্বানের তাওহীদী মশাল নতুনভাবে যাদের হস্তগত হলো তাদেরকে জানাই ফুলেল শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন। মহান আল্লাহ্ আপনাদের যোগ্য নেতৃত্ব ও দৃঢ় কর্মপন্থার যথাযথ বাস্তবায়নে শুব্বানকে আরো বেগবান করুন, ছাত্র ও যুব সমাজের কাজে শুব্বানকে আরো গ্রহণযোগ্য হিসেবে গড়ে তুলুন- এ কামনা ও দু'আ অবিরাম।

পরিশেষে, শুব্বান প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যারা এ সংগঠনকে ভালবেসেছেন, মেধা, শ্রম ও অর্থ দিয়ে শুব্বানের অগ্রযাত্রায় পাশে থেকেছেন তাদের আত্মত্যাগকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ও মহান আল্লাহর কাছে জাযায়ে খাইর কামনা করছি।

দারসুল কুরআন

মুহাম্মাদ ইব্রাহীম মাদানী
বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, যার কোনো শরিক নাই, যিনি মুসলিমদেরকে দলবদ্ধভাবে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। সালাত এবং সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের উপর, যিনি সর্বশেষ নবী এবং সর্বশেষ রাসূল, যিনি উম্মাতকে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন করতে আদেশ করেছেন এবং দলে দলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন।

অতঃপর, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, এদেশে নির্ভেজাল তাওহীদ ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ প্রচারকারী একটি অরাজনৈতিক ইসলামী সংগঠন। এরই একমাত্র যুবসংগঠন, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ। আগামী ২৯ জুলাই ২০২৩ তারিখে তাদের ১০ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ইন-শা-আল্লাহ্। উক্ত সম্মেলনকে কেন্দ্র করে তারা একটি স্মরণিকা প্রকাশ করবে এবং উক্ত স্মরণিকায় দারসুল কুরআন দেয়ার জন্য তারা আমাকে অনুরোধ করেছে। এজন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত, গর্বিত এবং দু'আ করছি আল্লাহ যেন এই সংগঠনটিকে কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম ও দায়েম রাখেন এবং সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন।

আমরা মুসলিমরা জানি, দারসুল কুরআন, এটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দারস। আমি এই দারসের জন্যে সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নম্বর আয়াত নির্বাচন করেছি। নিম্নবর্ণিত শিরোনামে দারস উপস্থাপিত হবে ইন শা আল্লাহ।

১। আয়াতের সরল অনুবাদ ২। আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ ৩। আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ৪। এবং আয়াত থেকে শিক্ষা।

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

১। আয়াতের সরল অনুবাদ:

আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র রশিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু। অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই-ভাই সম্পর্কে আবদ্ধ

হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিগর্তের দ্বারপ্রান্তে ছিলে, তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হও। (সূরা আলু ইমরান, আয়াত: ১০৩)

২। আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ:

ক. মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে কয়েক শতাব্দী ধরে শত্রুতা ছিল, অথচ তারাও পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেছে দেখে ইয়াহুদীরা চোখে আঁধার দেখতে থাকে। তারা লোক নিযুক্ত করে (তার নাম শাস বিন কাইস) যে, সে যেন আউস ও খাযরাজের সভাস্থলে গমন করে এবং তাদেরকে তাদের পুরাতন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাদের নিহত ব্যক্তিদের কথা যেন নতুনভাবে তাদেরকে মনে করিয়ে দেয় এবং এভাবে যেন তাদেরকে আবার উত্তেজিত করে তুলে। একদা এ ঔষধ তাদের ভেতর কাজও করে এবং উভয় গোত্রের মধ্যে পুরনো আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। এমনকি তাদের মধ্যে তরবারি চালনারও উপক্রম হয়ে যায়। সেই অজ্ঞতার যুগের গণ্ডগোল ও চিৎকার শুরু হয়ে যায় এবং একে অপরের রক্ত পিপাসু হয়ে পড়ে। স্থির হয় যে, তারা হাররার প্রান্তরে গিয়ে প্রাণ খুলে যুদ্ধ করবে এবং পিপাসার্ত ভূমিকে রক্তপানে পরিতৃপ্ত করবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) এ সংবাদ জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং উভয় দলকে শান্ত করেন। অতঃপর তিনি তাদের উভয় দলকে বলেন: "পুনরায় তোমরা অজ্ঞতা যুগের ঝগড়া শুরু করে দিলে? আমার গড়া শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ঠেলে তোমরা পরস্পরের মধ্যে তরবারি চালনা আরম্ভ করলে?" তারপরে তিনি তাদেরকে উল্লিখিত আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। এতে সবাই লজ্জিত হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ পূর্বে ঘটে যাওয়া পরিস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে থাকে। আবার তারা কোলাকুলি করে এবং হাতে হাত মিলিয়ে নেয়। পুনরায় তারা ভাই-ভাই সম্পর্কে পরিণত হয়।

খ. ইকরামা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিআল্লাহু আনহা)-কে যখন মুনাফিকরা অপবাদ দিয়েছিল এবং তাকে দোষমুক্ত করে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেছিলেন, তখন মুসলিমরা একে অপরের বিরুদ্ধে লেগে পড়েছিল, সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। (তাফসীর ইবনু কাছীর)

৩। আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:

قال تعالى : وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا

আর তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রশিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর।

حَبْلِ اللَّهِ দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

حبل الله (আল্লাহর রশি) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার। যেমন আল্লাহ্ বলেন:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ. سورة آلِ عِمْرَانَ: 11

আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির বাইরে যেখানেই তাদেরকে পাওয়া গেছে সেখানেই তারা লাঞ্ছিত হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা পবিত্র কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। একটি মারফু' হাদীসে রয়েছে যে, কুরআন কারীম আল্লাহ্ তা'আলার একটি দৃঢ় রশি এবং তাঁর সরল পথ। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে- 'আল্লাহর কিতাব যা আকাশ হতে পৃথিবীর দিকে লটকানো তাঁর রজ্জু বিশেষ।'

আরও একটি মারফু' হাদীসে রয়েছে- 'এ কুরআন মাজীদ আল্লাহ্ তা'আলার শক্ত রজ্জু, এটা প্রকাশ্য দীপ্তি। এটা সরাসরি আরোগ্য দানকারী এবং উপকারী। এর উপর আমলকারীর জন্যে এটা রক্ষাকবচ, এর অনুসারীদের জন্যে এটা মুক্তির উপায়।

আবদুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন: "ওই সব পথে তো শয়তানেরা চলে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পথে এসে যাও। তোমরা আল্লাহ্ পাকের রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। ওই রজ্জু হচ্ছে পবিত্র কুরআন। (তাফসীর ইবনু কাছীর)

وَلا تَفَرَّقُوا দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তথা আল্লাহ্ আমাদেরকে দলবদ্ধ জীবন যাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং দলে দলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন। (তাফসীর ইবনু কাছীর)

দলবদ্ধভাবে থাকার আদেশের ব্যাপারে এবং বিভক্ততা থেকে নিষেধের ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا، يَرْضى لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا، وأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ؛ وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا: قيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وإِضَاعَةَ الْمَالِ (رواه مسلم برقم 1715)

আবূ হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) বলেছেন: আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। যে তিনটি কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন তার একটি এই যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করবে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। তৃতীয় হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ যাকে তোমাদের শাসক বানিয়েছেন তোমরা তার কল্যাণ কামনা করবে বা সদুপদেশ দিবে। আর যে তিনটি কাজ তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ, তার একটি হচ্ছে বাজে ও অনর্থক কথা বলা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে অনর্থক বেশি বেশি প্রশ্ন করা এবং তৃতীয়টি হচ্ছে সম্পদ ধ্বংস করা। (মুসলিম ১৭১৫)

এমন বহু হাদীস রয়েছে, যেগুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে, একতাবদ্ধ অবস্থায় মানুষ ভুল ও অন্যায় হতে রক্ষা পায়। আবার বহু হাদীসে মতানৈক্য হওয়া থেকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও উম্মতের মধ্যে মতভেদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে ৭৩টি দল হয়ে গেছে, যাদের মধ্যে একটি দল মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে এবং জাহান্নামের আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা পেয়ে যাবে।

এরা ওই দল, যারা এমন জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যার উপর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন।

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا...

অর্থাৎ আর তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই-ভাই সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিগর্তের দ্বারপ্রান্তে ছিলে, তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন।

এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অজ্ঞতার যুগে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বড়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কঠিন শত্রুতা ছিল। পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ প্রায় সময়ই লেগেই থাকতো। অতঃপর যখন গোত্রদ্বয় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় তখন মহান আল্লাহর অনুগ্রহে তারা পূর্বের সব কিছু ভুলে গিয়ে সব এক হয়ে যায়। হিংসা বিদ্বেষ বিদায় নেয় এবং তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যায়। তারা পুণ্যের কাজে একে অপরের সহায়ক হয় এবং আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তারা পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে যায়। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে।

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصۡرِهِۦ وَبِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۝ وَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِهِمۡۚ ...

অর্থাৎ তিনিই সেই আল্লাহ্, যিনি স্বীয় সাহায্য দ্বারা এবং মুমিনদের সাহায্য দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন এবং তিনি তাদের অন্তরে প্রীতি স্থাপন করেছেন।' (সূরা আনফাল, আয়াত: ৬২-৬৩)।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন- "হে মুমিনগণ! তোমরা একেবারে জাহান্নামের অগ্নির ধারে পৌঁছে গিয়েছিলে এবং তোমাদের কুফরী তোমাদেরকে ওর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক প্রদান করত তোমাদেরকে ওই আগুন থেকেও রক্ষা করেছেন।

হুনায়েন যুদ্ধে বিজয় লাভের পর ধর্মীয় কল্যাণের কথা চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টন করতে গিয়ে কোনো কোনো অংশগ্রহণকারীকে কিছু বেশী প্রদান করেন তখন কোনো একজন লোক কিছু কটুক্তি করে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনসার দলকে একত্রিত করত একটি ভাষণ দান করেন। ওই ভাষণে তিনি একথাও বলেন:

"......يا مَعْشَرَ الأنْصارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا، فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي؟ وَعَالَةً، فأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي؟ وَمُتَفَرِّقِينَ، فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي؟ وِيقولونَ: اللَّهُ وَرَسولُهُ أَمَنُّ،.....

হে আনসারের দল! আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাইনি? অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেছেন। আমি কি তোমাদেরকে দলে দলে বিভক্ত পাইনি? অতঃপর আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে তোমাদের অন্তরে প্রীতি স্থাপন করেন। আমি কি তোমাদেরকে দরিদ্র পাইনি? অতঃপর আল্লাহ্ আমারই মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্পদশালী করেন। (প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে এ পবিত্র দলটি আল্লাহর শপথ

করে সমস্বরে) বলে উঠেন: আমাদের উপর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা:)-এর অনুগ্রহ এর চেয়েও বেশী (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং- ১০৬১)

৪। আয়াতের শিক্ষা:

- ✓ আল্লাহর কিতাব আল কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরার মাঝে রয়েছে শান্তি ও পাপমুক্তি, যে ব্যক্তি উভয়কে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরলো সে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।
- ✓ ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা এবং এটাকে আক্বীদা-বিশ্বাস ও পথ-পন্থা হিসেবে আঁকড়ে ধরা, যেনো ভ্রষ্টতা ও বিপথগামী হওয়া থেকে নিরাপদ রাখে এবং সর্বোপরি ধ্বংস ও ক্ষতি থেকেও রক্ষা করে।
- ✓ দ্বীন-ইসলামকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক এবং দলে-দলে বিভক্ত হওয়া এবং পরস্পর মতবিরোধ করা হারাম।
- ✓ আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে তাঁর নিয়ামতরাজির কথা স্বরণ করা এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা।
- ✓ শিরক এবং পাপকাজে লিপ্ত থাকা জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকার ন্যায়। অতএব, যে ব্যক্তির এ অবস্থায় মৃত্যু হবে সে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর হুকুম এবং ফায়সালায় জাহান্নামে পতিত হবে।

আমি এর আগে حَبْل الله -এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়েছি। এখানে এর ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু আনহুর ব্যাখ্যা দিয়ে শেষ করবো। তিনি বলেছেন:

وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ أي بالجماعة

অর্থাৎ তোমরা সকলেই দলবদ্ধ জীবনকে আঁকড়ে ধরো। (তাফসীরে ত্ববারী)। আর আত-তাফসীর আল মুয়াস্সারে সউদীআরবের কিছু বিশিষ্ট আলেম বলেছেন:

وتمسكوا جميعا بكتاب ربكم وهدي نبيكم

অর্থাৎ, তোমরা সবাই তোমাদের রবের কিতাব তথা কুরআনুল কারীম ও তোমাদের নবীর হাদয়ী তথা সুন্নাহকে আঁকড়ে ধর।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে পরিশেষে বলতে চাই, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করার তাওফীক দান করো, সকল প্রকার বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি থেকে রক্ষা করো, আমীন।

দারসুল হাদীস

আব্দুল্লাহীল হাদী
কোষাধ্যক্ষ
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় রাসূল, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সাহাবীবৃন্দ এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করবে তাদের উপর।

প্রাণপ্রিয় সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের ১০ম সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকায় দারসুল হাদীস হিসেবে সুপরিচিত কয়েক শব্দের একটি মূল্যবান হাদীস তুলে ধরছি, অতঃপর এর শিক্ষা ও প্রয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরার প্রয়াস পাবো। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ্।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ " .

সরল অনুবাদ

আবূ সাঈদ খুদরী রা. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "তোমাদের কেউ অন্যায় কাজ দেখলে সে যেন নিজ হাতে তা পরিবর্তন করে দেয়, যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে জিহ্বা (কথা) দ্বারা এর পরিবর্তন করবে। আর যদি সে ক্ষমতাও না থাকে, তখন অন্তর দ্বারা তা পরিবর্তনে সচেষ্ট থাকবে। তবে এটা ঈমানের দুর্বলতম স্তর।[১]

রাবী পরিচিতি

হাদীসটি বর্ণনা করেন সুপ্রসিদ্ধ ও জালীলুল কদর সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী তথা সাদ বিন সিনান আনসারী খাজরাযী খুদরী। তিনি বাইয়াতে রেযওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১১৭০টি। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে ৪৩টি, এককভাবে বুখারী ১৬টি ও মুসলিম ৫২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৭৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন ও বাকিউল গারকাদ কবরস্থানে দাফন করা হয়।[২]

আবু সাঈদ খুদরী রা. কর্তৃক হাদিসটি বর্ণনার প্রেক্ষাপট

মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে নিয়োজিত মদিনার গভর্নর মারওয়ান বিন হাকাম একবার মদিনার ঈদগাহে মেম্বার নিয়ে যান ও ঈদের সালাতের আগে খুতবা দেন। উভয় কর্ম সুন্নাহবিরোধী হওয়ায় আবু সাঈদ খুদরী

---

১ সহীহ্ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ৮৩, ইসলামিক সেন্টার: ৮৫), আবু দাউদ: ১১৪০, তিরমিযী: ২১৭২, ইবনে মাজাহ: ১২৭৫, নাসাঈ: ৫০০৮।

সিয়ারু 'আলামিল নুবালা লিজ জাহাবী: ৩ খন্ড, পৃ: ১৬৮, রাবী নং: ২৮ (মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ)

নিজেই বা অন্য বর্ণনা অনুসারে কোনো এক ব্যক্তি প্রতিবাদ করলে আবু সাঈদ খুদরী তার সমর্থনে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।[৩]

হাদিসটির গুরুত্ব

১. উক্ত হাদীসটি দ্বীনের অন্যতম মূলনীতি এবং এর বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে- একজন ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো কাজের আদেশ দিতে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতে বাধ্য।[৪]
২. ইমাম নববী র. বলেছেন: এটি ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ভিত্তিগুলোর মধ্যে একটি।[৫]

হাদীসের ব্যাখ্যা

হাদীসটির ব্যাখ্যায় প্রবেশের আগে হাদীসটির স্বপক্ষে একটি আয়াত ও আরো একটি হাদীস বর্ণনা করছি যদিও এর স্বপক্ষে অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে। আয়াতটি হলো:

﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ.﴾

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর এ সকল লোকই হবে সফলকাম।"[৬]
হাদীসটি হলো: হুযাইফাহ্ রা. কর্তৃক বর্ণিত, নবী সা. বলেন, "তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে। তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে, তা না হলে শীঘ্রই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আযাব পাঠাবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর কাছে দো'আ করবে; কিন্তু তা কবুল করা হবে না।"[৭]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসটি অন্যায় ও মন্দ কর্ম পরিবর্তন ও প্রতিরোধের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করছে। আর অন্যায় কর্ম পরিবর্তন ও প্রতিরোধের স্তর বর্ণনা করা হয়েছে দারসের জন্য আলোচিত হাদীসে। নিশ্চয়ই সকল মানুষ অন্যায় কাজে বাধা প্রদানের ক্ষেত্রে এক পর্যায়ের নয়। কেননা তারা বিভিন্ন স্তরের হবে তা হাদীসে প্রমাণিত। পরিবর্তনের সবচেয়ে উঁচু স্তর হচ্ছে হাত দ্বারা পরিবর্তন করা। যার হাত দিয়ে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে কথার মাধ্যমে পরিবর্তন করা এবং যেব্যক্তি কথার মাধ্যমেও পরিবর্তন করতে পারবেনা তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে অন্তর দিয়ে তা পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। এরপরে ঈমানের আর কোনো স্তর নেই, বরং এটিই হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দুর্বলতম স্তর, যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ সা. উক্ত হাদীসে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসের ভাষ্য **"তোমাদের মধ্যে যে কোনো মুনকার বা অন্যায় দেখবে"** এ অংশের ব্যাখ্যা

"তোমাদের মধ্যে" এ সম্বোধন সকল বালেগ পুরুষ ও নারীর জন্যই। **মুনকার বা অন্যায় হলো** যা সত্ত্বাগতভাবে মন্দ এবং তা দুইভাবে জানা যায়: (১) শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা (২) বিবেকের যুক্তির। তবে

---

৩ সহীহ্ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ৮৩, ইসলামিক সেন্টার: ৮৫)।

৪ আল জাওয়াহের আল লুলুইয়া: পৃ: ৩১৫।

৫ শারহু মুসলিম লিননওয়াবী: ২/২৪।

৬ আলে ইমরান: ১০৪

৭ তিরমিযী: ২১৬৯

শারঈ নিষেধাজ্ঞা ছাড়া পাপের হুকুম কার্যকর হবে না। আর সৎকাজ হচ্ছে তার বিপরীত, তথা শরীয়ত যেটাকে ভাল বলেছে তা সৎকাজ হিসেবে গণ্য হবে। **'দেখবে'** দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হলো এখানে 'দেখা'টি দুই ভাবে হতে পারে স্বচক্ষে দেখা বা জ্ঞানের মাধ্যমে দেখা অর্থাৎ সে নিজের চোখে দেখতে পারে বা বিশুদ্ধ সূত্রে তার কাছে সংবাদ পৌঁছতে পারে। উল্লিখিত সকল প্রকার দেখার আওতাভুক্ত হবে। যেমনটি উল্লেখ করেছেন ইবনু উসাইমীন।[৮]

অন্যায় কাজ পরিবর্তনের তিনটি স্তর

প্রথম স্তর

হাত দ্বারা পরিবর্তন বা বাধা প্রদান করা। এটা মূলত সক্ষমতাকে বুঝায়। সুতরাং যার হাত দিয়ে পরিবর্তনের সক্ষমতা রয়েছে তার জন্য সেটিই নির্ধারিত হয়ে যাবে। প্রশাসনিকভাবে কিংবা প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে পরিবর্তনের দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্র, সরকার ও তাঁর নিয়োজিত দায়িত্বশীলদের ওপর। পরিবারের কর্তাও তার অধীনস্থদের মাঝে এ পন্থায় পরিবর্তন করতে পারবে। কেননা তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে হাত ব্যবহারের ক্ষমতা রয়েছে।[৯]

দ্বিতীয় স্তর

জিহ্বা দ্বারা পরিবর্তন করা তার কর্তব্য, যার হাত দিয়ে পরিবর্তনের সক্ষমতা নেই। যেহেতু অন্যায়কারী তার চেয়ে বেশি ক্ষমতাধর। ফলে সে নিজের ক্ষতির আশঙ্কা করছে। তখন মুখে মুখে (হেকমতের সাথে) কথার মাধ্যমে পরিবর্তন ও সংশোধন করা ওয়াজিব।

কথা তথা জিহ্বা দিয়ে পরিবর্তনের পদ্ধতি

প্রথমে উক্ত অন্যায় কাজের শারঈ বিধান উল্লেখ করবে এবং কুরআন-হাদীসের আলোকে তার শাস্তির কথা নরম ভাষায় পেশ করবে। পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরে নসীহা প্রদান করবে। তাতে কাজ না হলে প্রযোজ্য হলে ধমক প্রদানসহ কঠিন ভাষায় সতর্ক করবে। মুখ দিয়ে পরিবর্তন এটা লেখনিরও অন্তর্ভুক্ত যেমনটি উল্লেখ করেছেন ইবনে উসাইমীন।[১০]

তৃতীয় স্তর

অন্তর দ্বারা পরিবর্তন করা। অন্তর দ্বারা পরিবর্তনের অর্থ হলো অন্যায় কাজ দেখার কারণে মনে কষ্ট অনুভব হওয়া ও তার প্রতি ঘৃণাবোধ হওয়া।[১১] তবে অন্তরে এই ঘৃণা পোষণ করাই শেষ কাজ নয়; বরং তা পরিবর্তন ও সংশোধনের জন্য অন্তরে সর্বদা অস্থিরতা অনুভব করা এবং এক্ষেত্রে কার্যকরী পদ্ধতি কী হতে পারে তা নিয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থার সাথে পরামর্শ করা অব্যাহত রাখতে হবে। এটিই হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দুর্বলতম স্তর।

অন্যায় কাজে বাধা দেওয়ার কিছু মূলনীতি

৮শারহুল আরবায়িন লিল উসাইমীন:৩৩৩ পৃ:

৯শারহুল আরবায়িন লিল আব্বাদ: উক্ত হাদিস দ্রষ্টব্য

১০শারহুল আরবায়িন লিল উসাইমীন: উক্ত হাদিস দ্রষ্টব্য

১১শারহুল আরবায়িন লিল আব্বাদ: উক্ত হাদিস দ্রষ্টব্য

অন্যায় কাজের প্রতিবাদে শক্তি প্রয়োগ করার আগে ইসলাম কিছু শর্ত আরোপ করেছে, যা পূর্ণ না হলে ব্যক্তির জন্য অন্যায়ের প্রতিবাদে শক্তি প্রয়োগ করা বৈধ হবে না। তা হলো:

১. কাজটি সর্বসম্মতিতে হারাম হওয়া।
২. অন্যায় কাজটির বিধান নিয়ে আলেমদের মাঝে মতানৈক্য না থাকা।
৩. পরিবর্তন বা বাধা দেওয়ার সামর্থ থাকা: পরিবর্তনে ইচ্ছুক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অবস্থা পরিবর্তনের শক্তি ও সামর্থ থাকা।
৪. বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার ভয় না থাকা: এই আশঙ্কা না থাকা যে, যদি শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তবে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে, নিরীহ মানুষের জীবন ও সম্পদ হুমকির মুখে পড়বে, শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে; বিপরীতে আরো অন্যায়-অপরাধ নানা মাত্রায় বেড়ে যাবে। পবিত্র কুরআনের সুরা ত্ব-হার ৯২-৯৪ আয়াতে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে ।

ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসআলা

১. যে ব্যক্তি এ দায়িত্ব পালন করবে তাকে ভালো কাজ সম্পাদন ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা, যে নিজে করবে না কিন্তু অন্যকে তা করতে বলবে তাকে হাদীসে জাহান্নামের গাধা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎ কাজে আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম না। আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম।[১২] এছাড়াও এ সংক্রান্ত আরো অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে।
২. উক্ত দায়িত্ব পালনকারীকে শরীয়তের জ্ঞান রাখতে হবে যাতে তিনি জ্ঞান দ্বারা ভালো ও খারাপ নির্ণয় করতে পারেন।[১৩]
৩. ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন: মন্দকে অস্বীকার করার চারটি স্তর রয়েছে:
প্রথমটি: অন্যায় চলে যায় এবং তার বিপরীতে ভালো প্রতিষ্ঠিত হয়।
দ্বিতীয়টি: অন্যায়টা একেবারে দূরীভুত না হলেও আগের তুলনায় কমে যায়।
তৃতীয়টি: যে অন্যায়টা দূরীভুত হবে তার মত আরেকটি অন্যায় প্রতিস্থাপিত হবে।
চতুর্থ: যে অন্যায়টি দূরীভুত হবে তার চেয়ে বেশি খারাপ আরেকটা অন্যায় প্রতিস্থাপিত হবে।
চারটি স্তরের হুকুম: প্রথম দুটি স্তর বৈধ, তৃতীয়টি ইজতিহাদের বিষয় এবং চতুর্থটি হারাম।[১৪]
সুতরাং একটা অন্যায়কে দূর করতে গিয়ে তার মত আরেকটি বা তার চেয়ে বড় কোনো অন্যায় চলে আসার সম্ভাবনা থাকলেও অন্যায়ের প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

---

১২ সহীহ্ বুখারী: ৩২৬৭।
১৩ সূরা বানী ইসরাইল: ৩৬।
১৪ ইলামুল মুয়াক্কিঈন লি-ইবনিল কাইয়্যিম: ৩/১২।

ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করার হিকমাহ বা রহস্য

তিনটি হিকমাহ বা রহস্য রয়েছেঃ

১. বান্দার উপর আল্লাহর হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা করা। (সূরা নিসাঃ ১৬৫)
২. আদেশ-নিষেধকারী তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। (সূরা আরাফঃ ১৬৪)
৩. আদিষ্ট ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করা হয়। (সূরা আরাফঃ ১৬৪)

হাদীসটি থেকে শিক্ষা

১. নবী মুহাম্মাদ সা. সমগ্র জাতিকে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যে, কেউ অন্যায় কাজ দেখলে তা প্রতিহত করবে। এটা বলার প্রয়োজন নেই যে, তার দায়িত্ব থাকা আবশ্যক। তাই যদি কেউ বলে যে, কে আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছেন? তার উত্তরে বলতে হবে যে, নবী সা.। কেননা, তিনি বলেছেন "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন দেখবে।"
২. যতক্ষণ না মন্দ নিশ্চিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মন্দের নিন্দা করা জায়েয নয়, এবং তা দু'টি দিক থেকেঃ প্রথম দিকঃ সে নিশ্চিত যে, এটা মন্দ। দ্বিতীয় দিকঃ কর্তার জন্য সে কাজটা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টা নিশ্চিত হতে হবে। কেননা কিছু কাজ আছে, যা অন্যায় কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে তা অন্যায় নয়। যেমনঃ রমযানের দিবসে অসুস্থ বা মুসাফির ব্যক্তির জন্য পানাহার করা।
৩. ইসলামী শরীয়তের সকল দায়িত্ব সক্ষমতার উপর নির্ভরশীল।
৪. শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেমন কাজ আছে তেমনিভাবে অন্তরেরও কাজ রয়েছে।[১৫]

পরিশেষে বলা যায়, ব্যক্তি ও সমাজকে অপরাধ মুক্ত করতে এবং শান্তির ধারায় ফেরাতে এমনকি আল্লাহর গজব থেকে রক্ষা করতে অসৎ কর্মের পরিবর্তন সাধন করা ও বাধা প্রদান করতে হবে। আর তা যদি হয় হাদীসটির আলোকে তবে আরো উত্তম হবে। ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও বিশৃঙ্খলা এড়ানো যাবে। আর আমাদের সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ হেকমতের সাথে এ কাজটি সম্পাদন করে ব্যক্তি ও সমাজকে অপরাধ মুক্ত রাখতে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ অপরাধ প্রতিরোধে সাধারণ ব্যক্তির ক্ষমতার তুলনায় সংগঠন আরো একধাপ এগিয়ে থাকে। আর উপরে বর্ণিত আয়াতে "উম্মত" দ্বারা একটি দল উদ্দেশ্য যা কোন সংস্থা বা সংগঠনকেও নির্দেশ করে। সুতরাং সংঘবদ্ধভাবে সমাজে সৎকাজের প্রসারের পাশাপাশি অন্যায় ও মন্দ কাজে প্রতিরোধ গড়ে তোলা আমাদের ৫ম দফা কর্মসূচি ইসলাহুল মুজতামা তথা সমাজ সংস্কার-এর মৌলিক কাজ। আসুন ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিকভাবে অন্যায়ের প্রতিরোধ করে ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর অর্জনে প্রত্যয়ী হই। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকল চেষ্টা কবুল করুন, আমীন।

১৫ শারহুল আরবায়িন লিল উসাইমীনঃ উক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।

১ম দফা-

আক্বীদাহ্ সংশোধন : সকল সংশোধনের সূচনা

আব্দুল মতিন
শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক, যুগ্ম-পরিচালক, শুব্বান রিসার্চ সেন্টার
ও প্রধান, স্মরণিকা প্রকাশ কমিটি

إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.. أما بعد: فإن خير الكلام كلامُ الله تعالى، وخير الهدي هديُ محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشرُّ الأمور محدثاتها. وكلَّ محدثة بدعةٌ، وكل بدعة ضلالةٌ، وكل ضلالة في النار..

আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তা'আলার প্রশংসা করছি যিনি আমাকে আক্বীদাহ্ এবং এ সম্পর্কিত বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার তাওফীক দান করেছেন। আর আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লার কাছে সহীহ্ আক্বীদাহ্ নিজের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত রাখতে প্রার্থনা করছি। যে আক্বীদাহ্ উত্তম সাহচর্য, যে আক্বীদাহ্ নবী, সিদ্দীক, শুহাদা ও সালেহীনের, আর এদের সাহচর্য কতই না উত্তম!

যে ইস্যুগুলোতে আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা লেখার তাওফীক দান করেছেন তার মধ্যে আক্বীদাহ সংশোধন সংক্রান্ত বিষয় একটি যা বাংলাদেশের অন্যতম তাওহীদভিত্তিক যুব ও তরুণদের সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর ৫ দফা কর্মসূচির **১**ম দফা। কী কারণে আমাদের বিজ্ঞ ইসলামিক চিন্তাবিদরা সংগঠনের কর্মসূচি হিসেবে একে চয়ন করেছেন এবং শীর্ষে স্থান দিয়েছেন- নিম্নবর্ণিত আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হবে ইন-শা-আল্লাহ্। আর এ প্রেক্ষিতেই শিরোনাম হিসেবে চয়ন করা হয়েছে **"আক্বীদাহ্ সংশোধন : সকল সংশোধনের সূচনা"**, তার কাছেই সুন্দর উপস্থাপনের তাওফীক প্রার্থনা করছি।

দ্বীন ইসলামে আক্বীদার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ইসলাম হচ্ছে আক্বীদা ও আমলের ধর্ম। ঈমান ও আক্বীদাহ ছাড়া কোনো আমল কবুল হবে না। আর সহীহ্ তথা বিশুদ্ধ আক্বীদাহ্ ছাড়া কোনো আমল উপকারী হবে না। কেননা, সাধারণভাবে আক্বীদাহ্ হচ্ছে দ্বীনী জ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং আক্বীদাহ্ আখলাক্ব থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আক্বীদাহ্ আদাব থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। আক্বীদাহ্ ইবাদাত থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। আক্বীদাহ্ মুআমালাত তথা লেনদেন থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। এটা শরীআহর হুকুমপ্রাপ্তের ওপরে প্রথম ওয়াজিব কর্ম। সুতরাং ইসলামে প্রবেশের সাথে সাথেই ইবাদাত শিক্ষার আগেই তাওহীদ জানা অপরিহার্য।
এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরব যা হলো। যেমনি হাদীসে বর্ণিত:

عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ" [رواه البخاري ومسلم].

অর্থাৎ পাঁচটি ভিত্তির উপর দ্বীনে ইসলাম স্থাপিত। (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল। (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা। (৩) যাকাত আদায় করা। (৪) বায়তুল্লাহর (কা'বা গৃহের) হজ্জ করা এবং (৫) রমযানের সিয়া পালন করা।

ইসলামের রুকনগুলোর প্রথম রুকন দুইটি মহান মূল বিষয়কে শামিল করেছে। আর তা হলো একজন মুসলিমের العقيدة الصحيحة বা বিশুদ্ধ আক্বীদাহ্ যা তার সকল আমল নোঙ্গর করার সুদৃঢ় বন্দর, ফলে তার সকল আমল আলম বিশুদ্ধ হয়ে যায়।

প্রথম মূল বিষয়টি হলো:

রব হিসেবে, প্রতিপালক হিসেবে এবং নাম ও গুণবাচক হিসেবে মহান আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদকে স্বীকার করা যা তাওহীদুল্লাহি তা'য়ালা (توحيد الله تعالى) -এর অন্তর্গত। কারণ এ পুরো বিশ্বজগতের তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রূপদাতা, খাদ্যদাতা, প্রদানকারী, নিষেধকারী, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা ও পরিচালনাকারী। তাঁকেই সুন্দর নামসমূহ ও পরিপূর্ণ উচ্চ গুণবাচক শব্দ দ্বারা আহ্বান করা হয়। যেমনটি তিনি নিজেই তাঁর নাম ও গুণ ধরে সম্বোধন করেছেন ও তাঁর রসূলও (সা.) তার গুণবাচন নাম ধরে আহ্বান করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

"তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" (সূরা শূরা: ১১)।

তিনিই এককভাবে সকল প্রকার ইবাদতের অধিকারী, সুতরাং এগুলো তিনি ব্যতীত আর কারো দিকেই সম্পৃক্ত করা যাবে।

প্রথম মূল বিষয় তথা একত্ববাদের অর্থই হলো لا إله إلا الله

দ্বিতীয় মূল বিষয় হলো:

বিধান প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ যা توحيد شرع الله تعالى -এর আওতাভুক্ত। এর অর্থ হলো মানবজীবনে কেউ শাসন পরিচালনা করা ও হুকুম জারি করতে পারবে না। শুধুমাত্র একজনই পারবেন, তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা। কারণ তিনিই তার সম্পর্কে বেশি জানেন যাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। ফলে তার কল্যাণকর বিষয়াবলি তিনিই সম্যক জ্ঞান রাখেন। যেমনটি তিনি নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন:

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾

"যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী, পূর্ণ অবহিত।" (সূরা মূলক: ১৪)।

সুতরাং তার সূক্ষ্মদর্শীতা ও পূর্ণ অবগত থেকেই তিনি সৃষ্টির জন্য বিধান প্রণয়ন করবেন যা তাদের জন্য সকল অবস্থা, সর্বকাল ও সকল স্থানের জন্য কল্যাণকর ও উপকারী। ফলে তিনি যা বিধান দেবেন তার থেকে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ, উচ্চতর ও অধিক হুকুমদাতা কেউ আর কখনো হতে পারবে না। যেমন তিনি নিজেই বলছেন:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

"আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?" (সূরা মায়েদাহ্: ৫০)। সুতরাং ইবাদতের ক্ষেত্রে যেমন لا إله إلا الله তথা আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কেউ নেই তেমনি হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রেও إلا الله হবেন। এ বিষয়ে যেমন তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন:

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না'। এটিই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।" (সূরা ইউসূফ: ৪০)।

আর এটিই হচ্ছে দ্বিতীয় মূল বিষয় যা আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লাকে বিধানদাতা হিসেবে একত্ববাদে স্বীকার করে নেয়া। অর্থ হলোمحمد رسول الله : যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করেছি। অতএব توحيد الله عز وجل এবং توحيد شرع الله تعالى মিলেই হচ্ছে.(لا إله إلا الله محمد رسول الله)

রসূল সা. যখন মুয়াজ রা.-কে যখন ইয়েমেনবাসীর কাছে প্রেরণ করলেন তখন তিনি তাঁকে বললেন:"সবার আগে তাদেরকে যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করবে তা হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ, যখন তারা এ বিষয়টিকে জানতে পারবে তখন তাদেরকে অবহিত করো যে, আল্লাহ্ তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। (সহীহুল বুখারী-৭৩৭২, সুনানে তিরমিযী-২৯০১)।

এ হাদীস তাওহীদের গুরুত্বের ব্যাপারে দালালত করে যা আক্বীদাহ্ পাঠের অন্যতম পাঠ। সুতরাং বলা যায়, রসূল সা. আমলের প্রতি আহ্বান করার আগে আক্বীদাহ্ বিশুদ্ধকরণের দাওয়াতের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সালাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করার আগে তাওহীদকে উপস্থাপন করেছেন।

রসূল সা. মক্কায় তের বছর অবস্থানকালে তিনি মানুষকে আক্বীদাহ্ বিশুদ্ধকরণের দিকে, তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁর উপর ফরজ বিষয়গুলো মক্কায় না, মদীনাতে থাকা অবস্থায় অবতীর্ণ করা হয়েছে। ফলে তা এটি নির্দেশ করে যে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে সবার আগে অগ্রাধিকার পাবে আক্বীদার শিক্ষাদান, আক্বীদাহ্ সংশোধন ও পবিত্রকরণের দাওয়াত। মানুষের কাছে আক্বীদাহ্ সংশোধনের আগে আমল দাবি করা হয়নি, বরং আগে আক্বীদাহ্ সংশোধনের দাবি নিয়ে আসা হয়েছে যাতে করে সহীহ্ আক্বীদার ভিত্তির উপর সকল আমল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

অনুরূপভাবে সকল নবী-রসূলদের তাদের কওমদের প্রতি প্রথম আহ্বানই ছিল তাওহীদ। আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজেই এর সারাংশ তুলে ধরে বলছেন:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ وفي قوله: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾

"আপনার পূর্বে আমি যে রসূলই প্রেরণ করেছি, তার প্রতি এ প্রত্যাদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত কোনো সত্য মা'বুদ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই এবাদত কর"। (সূরা আম্বীয়া: ২৫)। তিনি আরো বলেন:

"আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে পরিহার কর।" (সূরা আন নাহল: ৩৬)।

আবার এর বিস্তারিতরূপে হযরত নূহ আ. -এর থেকে বলছেন:

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قَالَ الْمَلأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾

"নিশ্চয়ই আমি নুহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো সত্য মাবুদ নেই। তা না করলে আমি তোমাদের উপর একটি মহা দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি। * তার কওম থেকে নেতৃবর্গ বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি।" (সূরা আ'রাফ: ৫৯-৬০)।

হযরত নূহ আ. প্রতি কওমের সীমালঙ্ঘনের বর্ণনায় এসেছে: "

﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

"হে আমার কওম! আমার মধ্যে কোনোই পথভ্রষ্টতা নেই। বরং আমি বিশ্বপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত রসূল'। * আমি তোমাদের নিকটে আমার প্রভুর রিসালাত পৌঁছে দেই এবং আমি তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়ে থাকি। কেননা আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন বিষয় জানি, যা তোমরা জানো না। (সূরা আ'রাফ: ৬১-৬২)।

নবী-রসূলদের তাদের কওমদের প্রতি প্রথম আহ্বানই ছিল তাওহীদ যা কুরআনে নবী-রাসূল সংক্রান্ত বর্ণনায় বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। আলোচনা লম্বা হয়ে যাওয়ার কারণে সকল আয়াত উল্লেখ করা হচ্ছে না।

কেন সহীহ্ আক্বীদাহ্ পাঠ করব ও জানব?

সহীহ্ আক্বীদাহ্ শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা নিম্ন রূপ:

১. আমলের আগে মানুষকে আক্বীদাহ্ শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে রসূলদের অনুসরণ করা। যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ :النحل: ৩৬]، وقال تعالى[

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ২৫].

২. শিরক ও বিদ'আতের পঙ্কিলতা হতে আমাদের আক্বীদাকে পরিচ্ছন্নকরণ এবং বান্দাকে কুফর ও শিরক থেকে রক্ষাকরণ হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তির মৌলিক বিষয়। কিন্তু পরিপূর্ণ নাজাত হলো জ্ঞান, বুঝ ও উপলব্ধিতে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের চাওয়া মোতাবেক কথা ও কর্মকে বিশুদ্ধ করে এবং ইবাদাতকে বিদাআত থেকে রক্ষা করা।

৩. শিরক ও বিদআতে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

৪. আক্বীদার জ্ঞান হলো যা আল্লাহর ব্যাপারে ভয় করতে শেখায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

৫. ফিতনা হতে মুক্তি পাওয়া, সুতরাং আক্বীদাহ্ ভিত্তিক ফিতনা হতে মুক্তি পেতে সহীহ্ আক্বীদার জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

৬. নানান বাতিল চিন্তা-চেতনা এবং বিভিন্ন মতাদর্শ ও ধর্মমতের বিরুদ্ধে সঠিক অবস্থান নিতে।

৭. নিজের মন থেকে জাহিলিয়াতকে দূর করতে।

ঈমান থাকলেই যথেষ্ট, আর আক্বীদার প্রয়োজন নেই

আক্বীদার গুরুত্ব বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, ঈমান থাকলেই যথেষ্ট আক্বীদার আর প্রয়োজন নেই দাবির ভ্রান্ততা। কেননা, যেখানে ঈমান ঈমান হিসেবে গণ্য হবে না যদি আক্বীদাহ্ বিশুদ্ধ না হয়। কারণ, আক্বীদাহ্ সহীহ্ না হলে ঈমান ও দ্বীন কোনটাই বিশুদ্ধ হবার নয়।]

সহীহ্ আক্বীদাহ্ শিক্ষার উপকারিতা:

১. শিরক থেকে মুক্ত রাখে: সহীহ্ আক্বীদার শিক্ষা মানুষকে শিরক্ থেকে মুক্ত রাখতে সহায়তা করে। বিশুদ্ধ আক্বীদাকে ভুলে যাওয়া শিরকে পতিত হওয়ার কারণ হয়। আর শিরকে পতিত হওয়া মানে জাহান্নাম অবধারিত। যেমনটি আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা নিসার ৪৮ নং আয়াতে বলছেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার সাথে অংশী স্থাপন করাকে মার্জনা করেন না। অবশ্য তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে মহাপাপে জড়িয়ে মিথ্যা রচনা করল"।

২. সহীহ্ আক্বীদাহ্ পাপ থেকে দূরে রাখে: সহীহ্ আক্বীদাহ্ মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয়কে বৃদ্ধি করে এবং পাপ থেকে দূরে রাখে। আক্বীদাহ্ তাওহীদকে অন্তর্ভুক্ত করে যা কোন কাজটি আল্লাহর জন্য আর কোন কাজটা আল্লাহর জন্য না তা শিক্ষা দেয়। আর আল্লাহর পরিচয় জানা মানেই আল্লাহর ভয়ে ভীতু থাকা। সুতরাং বান্দা যতই আল্লাহর পরিচয় ও ক্ষমতা জানবে ততই তাঁর ব্যাপারে ভয় আরো বৃদ্ধি পাবে।

৩. সহীহ্ আক্বীদাহ্ সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে রক্ষা করে: শুবহাত তথা সংশয়পূর্ণ বিষয় সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় তরঙ্গায়িত হচ্ছে। বিশ্বসমাজ ধ্বংসাত্মক মতবাদ, অধঃপতিত চিন্তা-চেতনা, বাতিল মানহাজে আজ পরিপূর্ণ। সুতরাং উল্লিখিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে একজন মুসলমানের সামনে সহীহ্ আক্বীদার জ্ঞান ও তার বিষয়ে সঠিক বুঝ থাকা ছাড়া আর কোনো গতি নেই, যাতে তার সামনে তাইয়্যেব থেকে খবীস, সহীহ্ থেকে যয়ীফ এবং হক্ব থেকে বাতিল স্পষ্ট ও পার্থক্য হয়ে যায়।

কীভাবে আক্বীদাহ্ সংশোধন হবে?

আক্বীদাহ্ হচ্ছে সকল বিষয়ের মূল ভিত্তি এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা হবে এর ভিত্তিতে, সুতরাং আক্বীদাহ্ সংশোধনে যা করতে হবে:

১. মুসলমানদের অন্তর থেকে ব্যাপক কুলষিত ও নোংরা ধারণা এবং পচা ও নষ্ট যে গাদ রয়েছে যার ব্যাপারে উলামারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম আলোচনা ও লেখালেখি করেছেন তা মুক্ত করতে হবে। যেগুলোকে এখনো মুসলমানদের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে; ফলে তাদেরকে সহীহ্ ও বিশুদ্ধ আক্বীদাহ্ হতে বিচ্যুত করছে।

২. আমাদেরকে দ্রুত ফিরে যেতে হবে এ উম্মতের সর্বোত্তম ও স্বর্ণালী যুগে যার ব্যাপারে রসূল সা. বলেছেন:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ،

অর্থাৎ আমার উম্মাতের সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষ (সাহাবীগণ)। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। তারপর তৎপরবর্তী যুগ। (সহীহ্ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন) হাদীস নং-৩৬৫১।) যেযুগগুলো নির্মল উৎস -কিতাব ও সুন্নাহ্- থেকে আক্বীদাহ্ গ্রহণ করেছিলেন। যারা নস গ্রহণে তাহরীফ অথবা তা'বীলের ছলচাতুরিতে মত্ত হতেন না। বরং তারা যেঅর্থকে নির্দেশ করত সে অর্থকেই গ্রহণ করতেন এবং তারা সেই অবস্থা ও ধরনের (الكيفيات) বাইরে ছিলেন যেখানে আক্বলকে কাজে লাগনোর কোনো Scope নেই।

৩. এ ব্যাপারে দৃঢ় ঈমান রাখতে হবে যে, আক্বীদার সাথে যাই সম্পর্ক রাখে তার সকলই কিতাব ও সুন্নাহ্তে রয়েছে এবং এ দুইটিই যথেষ্ট এবং তাতেই রয়েছে আরোগ্য। আর যে ব্যক্তি এ দুইটিকে যথেষ্ট মনে করবে না, আল্লাহ্ যেন তাকে আর অমুখাপেক্ষী না করে।

৪. এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, আল্লাহ্ জাল্লা ওয়া 'আলা তার পরিচয়, তার একত্ববাদ এবং আক্বীদাহ্ সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে বুঝার ক্ষেত্রে আমাদের আক্বলের উপর ক্ষমতা ন্যস্ত করেনি। এর কারণ হলো এ বিষয়গুলো অদৃশ্য, ফলে সেগুলো বুঝার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আক্বল স্বয়সম্পূর্ণ নয়। বরং নিষ্কলুষ ওহী থেকে গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং এগুলোর ব্যাপারে বর্ণিত নস্কে বুঝা আক্বলের অপরিহার্য কর্তব্য। অতএব, আরবদের মাঝে সেই প্রসিদ্ধ প্রবাদ মারাত্মক ভুল হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে :

" ربنا عرفوه بالعقل "

অর্থাৎ তারা আমার রবকে আক্বল দ্বারা চিনতে পেরেছে। বরং এই প্রবাদের বিশুদ্ধ রূপ হিসেবে বলা যায়:

"ربنا عرفوه بنصوصه في الوحي، وآياته في الكون، وهدايته العقل للتدبر والفهم."

অর্থাৎ তারা আমার রবকে ওহী ভিত্তিক নস, বিশ্বজগতে বিরাজমান নির্দশন দ্বারা চিনতে পেরেছে, আর আক্বলের খোরাক হচ্ছে গভীরভাবে চিন্তা করা এবং উপলব্ধি করা ও বুঝা। সুতরাং যে শুধু আক্বলের উপর নির্ভর করবে সে বিরাট পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

৫. এ ব্যাপারে আরো দৃঢ় ঈমান রাখতে হবে যে, দলাদলি ও মতবিরোধের আর্বিভাবের আগে প্রাথমিক যুগের মুসলমানেরা নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের পার্থক্য সত্ত্বেও বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদার সরলতা ও স্পষ্টতার কারণে একে তারা সহজে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ও বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখনো এর (العقيدة الإسلامية الصحيحة) সরলতা ও স্পষ্টতা বিদ্যমান, তবে ধর্মতাত্ত্বিকদের জটিলতা এবং সুফিদের বাড়াবাড়ির কারণে তার বুঝ কঠিন করে তুলেছে, এর সঠিক বক্তব্যকে বিলুপ্তি ঘটিয়েছে, এর সৌন্দর্যকে বিকৃত করেছে; ফলে মুসলমানদেরকে বিশুদ্ধ আক্বীদাহ্ থেকে বহু দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

৬. এ ব্যাপারে আরো দৃঢ় ঈমান রাখতে হবে যে, সালফে সালেহীন - أهل السنة والجماعة -এর পথই হলো মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পথ, যেপথে সকল মুসলমানের চলা কর্তব্য। যেপথের উৎস হচ্ছে কিতাব ও সুন্নাহ। সেই পথ হচ্ছে শিথিলতা ও বাড়াবাড়ি মুক্ত মধ্যম পথ, যে মধ্যম পথ ছেড়ে শিথিলতা ও বাড়াবাড়ির পথে পা বাড়িয়ে এ উম্মতের অনেকে বক্রপন্থী ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। তাদের বক্রতা ও ভ্রষ্টতার অন্যতম অধ্যায় ছিল আল্লাহর সিফাত (صفات الله تعالى), আল্লাহর কর্মকাণ্ড ও বান্দার কর্মকাণ্ড (أفعال الله سبحانه وأفعال العباد), আল্লাহর শাস্তি (وعيد الله), সকল সাহাবী (রা) এবং ঈমান ও দ্বীনের ব্যাপারে (أسماء الإيمان والدين)।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আমাদের বিজ্ঞ ইসলামিক চিন্তাবিদরা সংগঠনের কর্মসূচি হিসেবে প্রথমে 'ইসলাহুল আক্বীদাহ্ বা আক্বীদাহ্ সংশোধন'কে মুসলিম জীবনে যে এর বিরাট গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কারণে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তা উল্লিখিত আলোকপাতে স্পষ্ট হয়েছে। তাই শুব্বানকে এ কর্মসূচির প্রচার ও প্রচারণাকে আরো জোরদার করতে হবে। তবেই তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হবে। ফলশ্রুতিতে উভয় পক্ষই দু'জাহানে কামিয়াব হবে ইনশাআল্লাহ।

২য় দফা-

আদ্-দা'ওয়াহ্ ওয়াত তাবলীগ বা আহ্বান ও প্রচারঃ আমাদের দা'ওয়াহ্

তানযীল আহমাদ
সাংগঠনিক সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হলো- আদ্-দা'ওয়াহ্ ওয়াত তাবলীগ । দা'ওয়াহ্ আরবি শব্দ, অর্থ ডাকা বা আহ্বান করা। তাবলীগ শব্দটিও একই ভাষার। অর্থ পৌঁছে দেওয়া। কোনো কিছুর পরিবর্তন সাধনে আদ্-দা'ওয়াহ্ ওয়াত তাবলীগ বা আহ্বান ও প্রচারের কোনো বিকল্প নেই। এ কর্মসূচি হয়ে থাকে শান্তিপূর্ণ কিন্তু এর ফলাফল হয় স্থায়ী এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম পর্যন্ত চলমান। আর আমূল পরিবর্তন তথা তাওহীদ ভিত্তিক এবং শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার মুক্ত কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্‌ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যই শুব্বানের কর্মসূচি। তাই এর গুরুত্বের দিক থেকে তা শুব্বানের ৫ দফা কর্মসূচির ২য় দফায় অন্তর্ভুক্ত। এমনকি শুব্বানের ১ম কর্মসূচির সঠিক বাস্তবায়নেও এ দফার গুরুত্ব অপরিসীম।

আমাদের দা'ওয়াহ্-এর উৎসঃ

আমাদের দা'ওয়াহ্-এর উৎস হলো আম্বিয়ায়ে কেরামের দা'ওয়াহ্-পদ্ধতি। তাদের দেখানো পথই আমাদের পথ। তাদের অনুসৃত নীতিই আমাদের নীতি। আমরা সেই নীতি ও আদর্শের আহ্বায়ক এবং ধারক-বাহক মাত্র। আমরা নতুন করে কোনো নতুন আদর্শ ও মতবাদের দিকে কাউকে আহ্বান করি না। আমরা নিষ্ঠার সাথে বিশ্বাস করি, তাঁদের পথেই প্রকৃত সফলতা। তাঁদের দা'ওয়াহ্ কালোত্তীর্ণ। সর্বযুগের জন্য উপযোগী ও সমসাময়িক। অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং মিশ্রিত বিশ্বাসের দূর্গ গুড়িয়ে দিয়ে সেখানে অবিমিশ্র তাওহীদের যে নবনির্মিত ঈমানী সৌধ গড়ে তোলা হয়েছে, আমরা সেই সৌধের রক্ষক ও পাহারাদার। আমাদের এই সৌধের শিরক- কুফর- নিফাকের কোনো কালো ছায়া থাকতে পারে না, জাহেলিয়াতের কোনো দুর্গন্ধ ছড়াতে পারে না। আমরা শিরক-কুফরে নিমজ্জিত ও জাহেলিয়াতের ময়লার স্তূপে পড়ে থাকা মানবসমাজকে মুক্তির মহাপয়গাম নিয়ে তাওহীদের এই সৌধের দিকে আহ্বান করে থাকি। কারণ আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আম্বিয়ায়ে কেরাম যে ঈমানী সৌধ বিনির্মাণ করেছেন তা কখনো ভেঙ্গে পড়ার নয়। যারাই সেটাকে ভাঙার চেষ্টা করেছে তারাই ধ্বংস হয়েছে। আম্বিয়ায়ে কেরাম যে আলোকবর্তিকা নিয়ে এই পৃথিবীতে আলোর মশাল জ্বালিয়েছিলেন, শয়তানের দুষ্ট চক্র সেই মশালকে নেভানোর জন্য হরহামেশাই অপচেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের দায়িত্ব হলো- সেই মশালকে প্রজ্জ্বলিত রাখা। তা যেন কোনক্রমেই নিভে না যায়। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাও তাই। আল্লাহ্ বলেনঃ

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ اللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ.

"এরা তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহর ফায়সালা হলো তিনি তার নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন। কাফেররা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন।" [সূরা আস-সফ, ৬১ : ৮]

পৃথিবীর উন্নত প্রযুক্তি এবং আধুনিক অস্ত্র যতই শক্তিশালী হোক না কেন, বিজ্ঞানীরা তাদের সমস্ত পরিশ্রম একত্রিত করে মারণাস্ত্র তৈরি করুক না কেন, সেগুলো যেমন আকাশের চন্দ্র-সূর্যকে ধ্বংস করতে পারে না, এমনকি সামান্য ক্ষতিও করতে পারেনা, ঠিক তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতা যতই চাকচিক্যময় ও চোখ ধাঁধানো হোক না কেন, ইসলামের কোনো ক্ষতি করার সামর্থ তাদের নেই। ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে ইসলামের সোনালী কাব্য রচিত হয়েছে। শত সহস্র আঘাত- আক্রমণের মুখে ইসলাম তার কালজয়ী আদর্শ নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ইসলামের উপরে যত আঘাত এসেছে অন্য কোনো ধর্ম ও মতবাদে এত আঘাত স্পর্শ করেনি। মুসলিমরা এমন এক জাতি যা কখনো বিলীন হওয়ার নয়, ইসলাম এমন এক ধর্ম যা কখনো বিলুপ্ত হওয়ার নয়। আমরা এমন এক জাতি যারা অন্য সব জাতির সাক্ষী হবো। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَ كَذٰلِكَ جَعَلۡنٰكُمۡ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوۡنُوۡا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوۡنَ الرَّسُوۡلُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيۡدًا.

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি 'মধ্যপন্থী উম্মাহ'তে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা সকল মানুষের ওপর সাক্ষী হতে পারো এবং এই রাসূল হতে পারেন তোমাদের ওপর সাক্ষী।" [সূরা আল বাকারা, ২: ১৪৩]

সুতরাং আমরা স্থায়ী জাতি। আমাদের দা'ওয়াহ্ শাশ্বত, চিরস্থায়ী। একটি শান্তিময়, পরিশীলিত ও ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্ব উপহার দেয়ার জন্য আমাদের দা'ওয়াহ্ অবিরতভাবে চলমান।

আমাদের দা'ওয়াহ্-এর বিষয়বস্তু:

বিষয়বস্তু এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, তা নির্ধারিত, নির্দিষ্ট, সঠিক ও নির্ভুল না হলে সে দা'ওয়াহ্ ফলদায়ক হবে না, শ্রম সার্থক হবে না, উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। ফলে, নিয়াতের বিশুদ্ধতা, আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা, উম্মাহর সংশোধন ও জাগরণের দৃপ্ত বাসনা এবং বিরতিহীন কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও সেদা'ওয়াহ্ লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। উম্মাহর কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ সাধিত হবে। আজ পুরো উম্মাহর সর্বাত্মক জাগরণের যে কথা আমরা বলছি, তার বাস্তবায়নের জন্য দা'ওয়াহ্‌র বিষয়বস্তু ঠিক করা অত্যন্ত জরুরি।

১. আমাদের দা'ওয়াহ্ এক আল্লাহর তাওহীদের দিকে। যে তাওহীদের জন্য আম্বিয়ায়ে কেরামের আগমন। যে তাওহীদের জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন। শত কণ্টকাকীর্ণ পথ মাড়িয়ে ঈমানের রাজপথকে মসৃণ করেছেন, পৃথিবীতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন, মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর গোলামে পরিণত করেছেন। আমাদের দা'ওয়াহ্ জাহেলিয়াতের শেকল ভেঙ্গে ইসলামের সুমহান আদর্শে আদর্শবান হওয়ার, দুনিয়ার সংকীর্ণ জীবনকে তুচ্ছ করে আখেরাতের অনাবিল শান্তির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের। আমাদের দা'ওয়াহ

আল্লাহদ্রোহী শক্তি তথা তাগুতের বিরুদ্ধে। আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং তাগুত বর্জনের গুরুদায়িত্ব নিয়ে নবী-রাসূলগণ এই ধরণিতে আগমন করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَ مِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ.

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছি এবং তার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি যে, "আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাগুতের বন্দেগী পরিহার করো।" এরপর তাদের মধ্য থেকে কাউকে আল্লাহ্ সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং কারোর ওপর পথভ্রষ্টতা চেপে বসেছে। তারপর পৃথিবীর বুকে একটু ঘোরাফেরা করে দেখে নাও যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছে।" [সূরা আন নাহল, ১৬ :৩৬] আল্লাহ আরও বলেন:

وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِیْۤ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ.

"আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই পাঠিয়েছি তাঁর প্রতি এ অহী করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই কাজেই তোমরা আমারই বন্দেগী করো।" [সূরা আল আম্বিয়া, ২১ :২৫]

আজ তাওহীদের বিপরীতে শিরকের যে সয়লাব, কুফর ও তাগুতের যে শোরগোল, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শিরকের যে মহামারী, তার বিরুদ্ধে আল্লাহর তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়া আমাদের অন্যতম কর্মসূচি। ইবাদতের নামে শিরকের যে মহোৎসব, রাজনীতির নামে শিরকের ছড়াছড়ি, কুরআন এবং হাদীসকে নির্লজ্জভাবে অপমানের যে হিড়িক, তার বিরুদ্ধে আমাদের দা'ওয়াহ্।

২. আমাদের দা'ওয়াহ্ বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের নিঃশর্ত অনুসরণের প্রতি। আমরা বিশ্বাস করি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রিসালাত উম্মাহকে উপহার দিয়েছেন তা চূড়ান্ত। তা সংশোধন করার, সংযোজন বিয়োজন করার কোনো এখতিয়ার কারো নাই। রিসালাতের এই শর্ত পূরণ করা সকল মুসলিমের উপর ওয়াজিব। আজকে মাযহাব ও দলের নামে রাসূলের সুন্নাহকে যেভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে আমাদের দা'ওয়াহ্ তার বিরুদ্ধে। সুন্নাহকে মেনে নেওয়া, জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে সুন্নাহর গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করার গুরু দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে। প্রাচ্যবিদরা (Orientalists) রাসূলের হাদীসের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র, অপকৌশল অবলম্বন করে একশ্রেণির মানুষের মধ্যে হাদীসের বিষয়ে যে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে তার বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দেওয়া দা'ওয়াহর আবশ্যকীয় অংশ। ঠিক তেমনি নিজের দল ও মাজহাবের দোহাই দিয়ে রাসূলের বিশুদ্ধ হাদীসকে পাশ কাটিয়ে অপব্যাখ্যা করে নিজস্ব মতামত প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা করার যে অশুভ প্রবণতা তার বিরুদ্ধে আমাদের জ্ঞানগত দা'ওয়াহ্ দিতে হবে।

৩. দা'ওয়াহ্ হলো সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন যে ইসলাম পরিপালন করেছেন তার পুনঃপ্রবর্তন। যুগের বিষাক্ত বাতাসে ইসলাম বিভিন্ন সময়ে কলুষিত হয়ে আজ যে পর্যায়ে এসেছে, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে, ইসলাম নয় এমন অনেক বিষয়কে অনেকেই ইসলাম মনে করে থাকে। এ সকল কুসংস্কার বিদূরিত করে সাহাবায়ে কেরাম যে ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন এবং আমল করেছেন তা ফিরিয়ে নিয়ে আসা আমাদের দা'ওয়াহর অন্যতম লক্ষ্য। মডারেট ইসলাম বা ক্লাসিক্যাল ইসলাম নাম দিয়ে পশ্চিমা সভ্যতার রঙ্গে ইসলামকে রঞ্জিত করার যে পরাজিত মানসিকতা তা রুখে দেওয়াও আমাদের দা'ওয়াহর অংশ।

৪. আমরা সকল প্রকার জুলুম নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শে একটি ন্যায়পরায়ণ, আদর্শিক ও তাওহীদভিত্তিক খেলাফত পুনরুদ্ধারের উদাত্ত আহবান জানাই। আমরা কখনোই ক্ষমতার জন্য দা'ওয়াহ্ দেই না, ক্ষমতা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যারা ইসলামের জন্য কাজ করে, তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় সমর্থন করে, সহযোগিতা করে, শিরক-কুফর-তাগুত বর্জন ও মূলোৎপাটনে প্রচেষ্টা করে তাদেরকে সমর্থন করি, তাদের জন্য দোআ করি। আমাদের এই দা'ওয়াহ্ নির্ভেজাল, নির্মোহ। দুনিয়ার সকল স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে আম্বিয়ায়ে কেরামের আদর্শকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা প্রচেষ্টা করি। আমরা বিশ্বাস করি, খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওওয়াহ পারে বিশ্বের বর্তমান দ্বান্দ্বিক অবস্থার অবসান ঘটাতে, শিরকের মূলোৎপাটন করতে, তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে। পশ্চিমা বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ওপরে যে অর্থনৈতিক শোষণ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও রাজনৈতিক অস্থিরতা লাগিয়ে রেখেছে যুগ যুগ ধরে, আমরা তার অবসানকল্পে আমাদের দা'ওয়াহ্ নিযুক্ত করতে চাই। বাক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতার মিথ্যা বুলি আওড়িয়ে পশ্চিমা বিশ্ব যে বস্তাপঁচা গণতন্ত্র বাজারজাত করেছে আমরা তার বিলুপ্তি চাই। বস্তুত, গণতন্ত্রের নাম দিয়ে দেশে দেশে অস্থিরতা, রাজনৈতিক সহিংসতা ও গৃহযুদ্ধ চলমান। পশ্চিমারা এর মাধ্যমে ফায়দা লুটতে চায়। আমাদের দা'ওয়াহ্ মানুষকে এসব ধোঁকাবাজির বিরুদ্ধে সজাগ ও সচেতন করা।

৫. আমাদের দা'ওয়াহ্ হলো ইসলামের সুমহান ও কালোত্তীর্ণ সংস্কৃতিকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী সংস্কৃতির সামাজিকীকরণ না হওয়ার ফলে যে অপসংস্কৃতি মুসলিম যুবকরা চর্চা করছে তাতে একদিকে যেমন তাদের দ্বীন বিনষ্ট হচ্ছে তেমনি সামাজিক মূল্যবোধ বিলুপ্ত হচ্ছে, সেই সাথে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে পশ্চিমারা তাদের নোংরা আদর্শকে সুকৌশলে মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা জানি, ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আবার সংস্কৃতি মানুষের নিত্য সঙ্গী। কোনো মানুষই সংস্কৃতিহীন নয়। কাজেই ইসলামের যে সংস্কৃতি, যে রীতিনীতি, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার ও অভ্যাস তা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকলেই পরিপালন করুক তা আমাদের একান্তই কাম্য। আমরা সেই লক্ষ্যে ছাত্র ও যুবকদের মাঝে কাজ করতে চাই। সংস্কৃতির সুস্থ ধারাকে বিকশিত করতে চাই। অপসংস্কৃতির রোধে এর বিকল্প হতে পারে না।

আমাদের দাওয়াহর মূলনীতিঃ

বলা হয়ে থাকে, Muslims are the worst seller of a best product and non muslims are the best seller of a worst product -মুসলিমরা হলো সবচেয়ে ভালো পণ্যের নিকৃষ্ট বিক্রেতা আর বিধর্মীরা হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট পণ্যের সেরা বিক্রেতা। এ জন্য দাঈদের ইসলাম প্রচারের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি জানা থাকা দরকার। দা'ওয়াহর মূলনীতিগুলো আত্মস্থ ও উপলব্ধি করা দরকার। কোন্ পদ্ধতিতে দা'ওয়াহ্ সবচেয়ে বেশি কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে তা নির্ধারণ করা চাই। আমরা সহায়ক হিসেবে বেশ কিছু মূলনীতি বর্ণনা করছি।

১. ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া। জ্ঞানই আমাদের দা'ওয়াহর মূল অস্ত্র। কাজেই যারা নিজেদেরকে দা'ওয়ার কাজে নিযুক্ত করবেন তাদের অবশ্যই ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক জ্ঞান থাকা চাই।

২. ব্যক্তি জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা বা জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে অনেক দলিল বর্ণিত হয়েছে।

৩. দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার সাথে দা'ওয়াহ্ প্রদান করা। দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অভাবেই আমাদের অনেকের কষ্টসাধ্য দাওয়াহ ফলপ্রসূ হয় না, অবিরাম কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায় না। এজন্য দাঈদের অনেক বেশি বিচক্ষণ হতে হবে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায় জানা থাকতে হবে। ইসলামের আবশ্যকীয় বিজয় সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকা যাবে না। সময়ের পরিবর্তনে, যুগের আবর্তনে মানুষের মন মেজাজ ও রুচির যে পরিবর্তন সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। আরবিতে প্রচলিত একটি কথা হলো *من جهل بأهل زمانه فهو جاهل- যে ব্যক্তি তার সময়যুগীয় লোকদের সম্পর্কে অনবগত সে আসলেই মূর্খ*। কাজেই বিচক্ষণতার দাবি হলো, আমরা যেন হাল যামানার বিভিন্ন মতবাদ- মতাদর্শ এবং নিত্য নতুন সমস্যা ও এসবের পেছনের মূল কারণ ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

৪. পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সে মাফিক দা'ওয়াহ্ দেওয়া। আমরা জানি পরিকল্পনা কাজের অর্ধেক। একটি সুন্দর ও যুগোপযোগী পরিকল্পনা কার্য বাস্তবায়নে অনেক বেশি প্রভাব ফেলে। পক্ষান্তরে সঠিক পরিকল্পনা না থাকলে কিংবা ভুল পরিকল্পনা থাকলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয় না। পশ্চিমা বিশ্ব কর্তৃক মুসলিম দেশগুলোর উপরে যে সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক আগ্রাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা ও পদক্ষেপ কেমন হওয়া চাই সে সম্পর্কে পূর্ব পরিকল্পনা থাকতে হবে। তা না হলে আমাদের দা'ওয়াহ্ সঠিক ট্রাক থেকে হারিয়ে যাবে।

৫. সমমনা ইসলামী সংগঠনগুলোর সাথে পরামর্শভিত্তিক দা'ওয়াহ্ প্রদান; যা আজকে অনেকটাই উপেক্ষিত। আমাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মঅহমিকা ও সন্দেহ থাকায় আমরা

উম্মাহর এই ক্লান্তিলগ্নেও পরামর্শভিত্তিক দা'ওয়াহ্ প্রদানে প্রতিনিয়ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছি। বাতিল শক্তি এবং বিদআতিরা যখন একযোগে ইসলামের মূল ধারায় আঘাত করতে বদ্ধপরিকর সে মুহূর্তে আমাদের পরামর্শভিত্তিক পরিকল্পনা মাফিক দা'ওয়াহ্ অত্যাবশ্যক। পরামর্শভিত্তিক দা'ওয়াহ্ প্রদান এই যুগের অন্যতম অব্যর্থ মাধ্যম।

৬. আক্বীদাহ ও আমলের ক্ষেত্রে সালাফদের মানহাজের পূর্ণ অনুসরণ। তাদের মানহাজই সবচেয়ে নিরাপদ, আমাদের আস্থার জায়গা। তারাই এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান, পবিত্র হৃদয়ের অধিকারি, পূণ্যবান এবং অতুলনীয় জ্ঞান ও বিচক্ষণতার মূর্ত প্রতীক। তবে হ্যাঁ, যুগের পরিবর্তনে আমাদের দা'ওয়াহ্ উপস্থাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসতে পারে। যেহেতু বর্তমান সময়ে দা'ওয়াহর উপকরণ অনেক বেশি সেহেতু আমাদের সালাফদের মানহাজের মৌলিকত্ব ঠিক রেখে নূতন নূতন কলাকৌশল আবিষ্কার ও প্রয়োগ করা যেতে পারে। মোটকথা, দা'ওয়াহ্ উপস্থাপনে যেন কোনো জড়তা, একগুয়েমি ও বিরক্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। তা যেন আকাঙ্ক্ষিত, আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হয়- তবেই তা অধিক ফলপ্রসূ হবে।

৭. দা'ওয়ার নামে সকল প্রকার দলাদলি, হিংসা বিদ্বেষ থেকে বিরত থাকা। দা'ওয়াহ্ যদি আমাদের পরস্পরের মাঝে দলপরস্তি, গীবত-শেকায়েত, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার সৃষ্টি করে তাহলে তা কখনো ইসলামী দা'ওয়াহ হতে পারে না। আজ সংগঠনের জন্য আমরা আমাদের দা'ওয়াহকে ব্যবহার করছি, নিজস্ব চিন্তা বাস্তবায়নের জন্য কুরআন এবং সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করছি। ফলে আমাদের দা'ওয়াহ কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের মুখ দেখছে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভক্ত ও পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন মানুষদেরকে ঈমানের সুতায় এমনভাবে গেঁথেছিলেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে বেনজির। আল্লাহ্ বলেন:

وَ اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّاۤ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

আর তিনি মুমিনদের অন্তর পরস্পরের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। তুমি সারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করলেও এদের অন্তর জোড়া দিতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের অন্তর জুড়ে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী। [সূরা আল আনফাল, ৮: ৬৩]

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا ؗ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ.

মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে আপোষহীন এবং নিজেরা পরস্পর দয়া পরবশ। তোমরা যখনই দেখবে তখন তাদেরকে রুকু ও সিজদা এবং আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি কামনায় তৎপর পাবে। [সূরা আল ফাতহ, ৪৮ : ২৯]

এই আয়াত থেকে এটাও বুঝা যায় যে, দাঈগণ যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনে মনোযোগী হন, রুকু সিজদা বেশি করে করেন তাহলেই তাদের পরস্পরের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করবে। আর যদি দুনিয়ার মোহ, লোভ-লালসা, পদমোহ ও পাপ কাজে জড়িয়ে পড়েন তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মাঝে হিংসা বিদ্বেষের আযাব নাযিল করবেন।

৮. বিদআত ও বিদআতীদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। তাদের সাথে ওঠাবসা, বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না। যদি কেউ এমনটি করে তাহলে তিনি বিদআতের বিরুদ্ধে সঠিক কথা বলতে বিব্রত বোধ করবেন। ফলে দা'ওয়াহর অন্যতম উদ্দেশ্য তথা বিদআতের মূলোৎপাটন ব্যাহত হবে।

৯. ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার দিকে দা'ওয়াহ্ প্রদান। ইসলাম যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সেহেতু ইসলামের পরিপূর্ণতার দিকে দা'ওয়াহ্ প্রদান করতে হবে। বিশেষ কিছু মাসআলা নিয়ে বা একটি দিক নিয়ে এত বেশি আলোচনা করা যাবে না যাতে করে ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়, মানুষের নিকটে ইসলাম কতিপয় মাসআলার নাম হিসেবে পরিচিত হয়। এমনটি সফল দা'ওয়াহর অন্যতম প্রধান অন্তরায়। তবে হ্যাঁ, যে পরিবেশে ইসলামের যে বিধানটি অবহেলিত বেশি সেই পরিবেশে সেই বিধানের আলোচনা বেশি হওয়া উচিত।

আধুনিক যুগে দা'ওয়াহর ব্যর্থতার মৌলিক তিনটি কারণ:

প্রথম কারণ : মাধ্যমকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা। অর্থাৎ দা'ওয়াহ্ প্রদানের জন্য যে মাধ্যমগুলো আমরা ব্যবহার করি, যেগুলোর সাহায্যে আমরা সহজভাবে দা'ওয়াহর কাজ আঞ্জাম দেই সেগুলোকেই লক্ষ্য উদ্দেশ্যে হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি। অথচ সেগুলো কেবল মাধ্যম, চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়। যেমন দ্বীনি সংগঠন। সংগঠন হলো ঐক্যবদ্ধভাবে খুব সহজেই এবং পরিকল্পিত উপায়ে ইসলামের দা'ওয়াহ্ ব্যাপকহারে প্রদানের সর্বোত্তম মাধ্যম। আধুনিক যুগে যা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সংগঠন কখনোই দা'ওয়াহর লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না। অথচ আজকে ইসলামী সংগঠনগুলোর অনেক কর্মী সংগঠনকেই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। যেন দা'ওয়াহ্ নয়, সংগঠন করাটাই মূল উদ্দেশ্য। আর এর ফলে পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ, কুৎসা রটনা, কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি দেখতে পাওয়া যায়। একে অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বী এমনকি শত্রু মনে করে। এবং এর ফলে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় ব্যাহত হয়। অথচ পরস্পরের মাঝে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক কাম্য ছিল।

দ্বিতীয় কারণ : শাখা- প্রশাখাগত মাসআলায় বাড়াবাড়ি এবং এর জন্য শক্ত ও কঠিন শব্দ প্রয়োগ। আমাদের দেশে কিংবা ভারতীয় উপমহাদেশে এই মারাত্মক ব্যাধি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সংক্রামক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ শাখা মাসআলায় মতানৈক্য নূতন নয়, সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই চলমান। ফিকহের কিতাব যারা অধ্যয়ন করেন তারা সকলেই এ কথার সত্যতা স্বীকার করবেন। এবং এও স্বীকার করবেন যে, এমন অনেক মাসআলা আছে যেখানে দুই বা তিনটি মতই সঠিক অথচ

আমাদের অনেকেই মনে করেন, প্রত্যেকটি মাসআলায় একটি মাত্র মত সঠিক হতে পারে, যা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। অপরদিকে শাখা-প্রশাখা মাসআলা নিয়ে আমরা প্রচুর সময় ব্যয় করি, অথচ পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিমদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে, ইসলামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত বিষয় নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি করছে। একজন আরব স্কলার একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, আমি একবার উত্তর আমেরিকায় মুসলিমদের বৃহত্তর একটি সম্মেলনে বক্তৃতা করছিলাম। আমার বক্তব্য ছিল, পশ্চিমা বিশ্ব কীভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপরে অর্থনৈতিক শোষণ চালাচ্ছে। খুব তথ্যবহুল বক্তৃতা দেয়ার পরে আমি যখন নামছিলাম তখন এক যুবক হন্তদন্ত হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসলো। আমি বুঝতে পারলাম সে খুব পেরেশান এবং হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করতে চায়। আমি ধারণা করছিলাম সে হয়তো আমার বক্তৃতার বিষয় নিয়েই আলোচনা করবে। কিন্তু সে এসে আমাকে প্রশ্ন করলো, স্যার! আপনি যে টাই পড়েছেন তা কি পড়া জায়েয? আমি কি উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না।

ফিকহী মতানৈক্য থাকতেই পারে কিন্তু তাই বলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ লোপ পাবে কেন? সালাফদের মাঝেও এমন অনেক মাসআলা মতানৈক্যপূর্ণ ছিল, কিন্তু তাদের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না, হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না। একে অপরের কল্যাণকামী ছিলেন।

তৃতীয় কারণ : দুনিয়াবী স্বার্থ, নেতৃত্বের মোহ, অপরকে দমানোর কুটকৌশল অবলম্বন এবং নিজের আমিত্ব ও বিশুদ্ধতার বড়াই করা। এটি যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও হতে পারে ঠিক তেমনি সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও এর চর্চা থাকতে পারে। দাঈগণ যদি নিজেদেরকে চূড়ান্ত সঠিক মনে করে এবং বাকি সবাইকে ভ্রান্ত মনে করে তাহলে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ আশা করা যায় না। ঠিক তেমনি নিজের সাংগঠনিক বলয়কে চূড়ান্ত বিশুদ্ধ মনে করে অন্যদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলে দা'ওয়াহ্ কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবে না।

পরিশেষে, ইসলামী দা'ওয়াহর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমরা কমবেশি সকলেই জানি। দা'ওয়াহ্ না দিলে ব্যক্তি থেকে শুরু করে পুরো ইসলাম যে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাও আমরা জানি। কিন্তু এরপরেও আমরা আমাদের গাফলতি থেকে সতর্ক হচ্ছি না। আমাদের মনে রাখা উচিৎ, আল্লাহ্ তা'আলা তার দ্বীনের হেফাজত করবেন, দ্বীনকে বিজয়ী করবেন এবং কোনো না কোনো বান্দাকে দিয়ে দ্বীনের কাজের আঞ্জাম দিবেন। সৌভাগ্যবান তো তারাই যারা নিজেকে সেই খেদমতে উজার করে দিতে প্রস্তুত, আর হতভাগা তারাই যারা গাফলতির মহানিদ্রা থেকে এখনো জাগতে পারেনি। ওদিকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য যখন চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গেছে, দ্বীনের মশাল নিয়ে একদল মুসলিম যুবা অগ্রসর হচ্ছে, পশ্চিমাদের ফকটাবাজি দিন দিন স্পষ্ট হচ্ছে এবং ইসলামকেই সভ্যতার শেষ ঠিকানা হিসেবে গ্রহণের জন্য বিবেকবানরা তৈরি হচ্ছে, অবিশ্বাসের মোহমায়াময় প্রাসাদ ধ্বসে গিয়ে ঈমানের সুরম্য অট্টালিকা পুনরায় নির্মিত হচ্ছে, শত্রুরা দিক্বিদিকশূন্য হয়ে পেরেশান হচ্ছে তখনও আমরা গাফলতির নিদ্রা থেকে জাগতে পারছি না। তাহলে আর কবে......?

৩য় দফা-

আত্ তানযীম বা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা: সংগঠন ব্যবস্থাপনার পথ ও পদ্ধতি

ফারুক আহমদ
সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস, বাংলাদেশ

একটি জাতিগোষ্ঠীর সংগঠনসমূহ যত বেশি শক্তিশালী সেই জাতিগোষ্ঠী তত বেশি শক্তিশালী। কোনো একটা বড় কাজ করার জন্যে কিছু মানুষের সুপরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধ চেষ্টাই হলো সংগঠন। সংগঠিত মানুষ-যাদের বিভিন্ন দক্ষতা রয়েছে, যারা একটি উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কার্যক্রমের লক্ষ্য নির্ধারিত এবং যেখানে পদ্ধতিগতভাবে সকলেই পরস্পরের নিকট দায়বদ্ধ। কাজ একা একাও করা যায়; কিন্তু একা একা করার একটা পরিমাণগত সীমা আছে। তার সুফল বেশি মানুষ পায় না। সুফল পেতে হলে ওই একই মাপের আরও অনেক মানুষের দরকার হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- হেনড়ি ফোর্ড, বিংশ শতকের শুরুতে তিনি যখন আধুনিক মটরগাড়ি তৈরি করতে শুরু করলেন তখন একা যদি তাঁকে ওই গাড়িগুলো উৎপাদন করতে হতো তবে বছরে সব মিলে হয়তো তিনি পাঁচটি গাড়ি তৈরি করতে পারতেন। এর চেয়ে বেশি বানাতে গেলে প্রতি পাঁচটি গাড়ির জন্য তাঁর কাছাকাছি মেধার একজন করে লোক দরকার হতো। কিন্তু সংগঠন বানানোর ফলে এত মেধাবী লোক তাঁর দরকার হয়নি। অল্পকিছু মাঝারি মানের মানুষ এবং হাজার হাজার সাধারণ শ্রমিক নিয়ে তিনি বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে কম খরচে গাড়ি পৌঁছাতে পেরেছিলেন।[১]

কবিতার ভাষায়-

একটি লতা ছিঁড়তে পারো তোমরা সকলেই,
কিন্তু যদি দশটি লতা পাকিয়ে এনে দেই,
তখন তারে ছিঁড়ে ফেলা নয়তো সহজ কাজ,
ছিঁড়তে গেলে পাগলা হাতি হয়তো পাবে লাজ।

এই যে, -দশটা লতা পাকিয়ে এনে দেই- এই পাকানোটাই হলো সংগঠন। সংগঠন গড়ে তোলে ব্যক্তি, কিন্তু ব্যক্তির চেয়ে এটা অনেক বড়। কিছু মানুষ কোনো একটা উদ্দ্যেশ্যে সমবেত হলেই তা সংগঠন হয় না। দল আর সংগঠন এক নয়। দলের মধ্যে সুপরিকল্পিত কর্মসূচির আলোকে সুবিন্যস্ত নেতৃত্ব-পরম্পরা গড়ে তোলা সম্ভব হলেই তা হয়ে উঠে সংগঠন। সাধারণভাবে দলের সদস্য নির্বাচন করা হয় দক্ষতা অনুযায়ী; ব্যক্তিত্ব দিয়ে নয়। কিন্তু সংগঠনে নেতৃত্ব নির্বাচন করা হয় ব্যক্তিত্ব দিয়ে।

সংগঠন উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপ/ ক্রমবিকাশ

[1] সংগঠন ও বাঙালি, আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা-১২

তৃণমূল পর্যায়ে শুব্বানের একটি শাখার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বুঝা কর্মীদের জন্য জরুরি একটি বিষয়। একটি শাখা সংগঠন যখন পরিপূর্ণতা ও সামর্থ্যের দিকে এগিয়ে যায় তখন বিভিন্ন দিকে তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং দায়িত্বশীল তখন নেতৃত্বের ধরন পরিবর্তন করেন। এটা সম্ভব হয় একটি পরিচালন-রীতিতে শুরু করে, কোচিংয়ের মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে, তারপর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে শেষ করার মাধ্যমে। নিম্নলিখিত পর্যায়গুলো হলো একটি সংগঠন বা দলের বিভিন্ন স্তর[২]:

গঠন (Forming): এ পর্যায়ে দলটি একে অপরের সাথে পরিচিত হয় এবং আচরণবিধি তৈরি করে। সদস্যরা আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখে এবং একে অপরকে অপরিচিত হিসেবে গণ্য করে।

আলোচনা (Storming): সদস্যরা তাঁদের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে শুরু করে। তবে নিজেদেরকে সংগঠনের অংশ হিসেবে না ভেবে ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করে। তাঁরা দলনেতার নিয়ন্ত্রণে বাধা দেয় এবং বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করেন।

মূল্যবোধ তৈরী (Norming): সদস্যরা নিজেদেরকে দলের অংশ হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে এবং বুঝতে পারে যে, অন্যের মতামতকে গ্রহণ করে নিয়েই তাঁরা সাফল্য অর্জন করতে পারবে।

কর্মসম্পাদন (Performing): দলটি একটি উন্মুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশে কাজ করে যেখানে নমনীয়তাই মূল পন্থা এবং ক্ষমতাতন্ত্রের চর্চা এখানে কম।

সমাপ্তি (Adjourning): ভূমিকায় পরিবর্তন আনয়ন করতে দলটি বছরে একটি বার্ষিক মূল্যায়ন পরিচালনা করে এবং সদস্যদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে।

দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী অনুশাসন পরিপালনের বাঁকে বাঁকে আমাদের এমন কিছু পরিচালনযোগ্য ও সংশোধনযোগ্য সমস্যা, দুর্বলতা, অক্ষমতা, সংকীর্ণতা, আত্মসর্বস্বতা আছে, যা দিয়ে সুযোগ্য সংগঠন গড়ে তোলা ও বিকাশের বড় আঞ্জাম আয়োজনে এগিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হচ্ছে না। অধিকাংশ মানুষের সংগঠনের জন্য সময় বের করতে না পারার প্রবণতাটাও এ জন্য কম দায়ী নয়। হাদীসে কুদসীতে এসেছে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِيْ أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ-

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি তোমার সময় বের করে নাও তবে আমি তোমার অন্তরকে অভাব-মুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার দরিদ্রতার পথ বন্ধ করে দিব। আর যদি তা না কর, তবে আমি তোমার হাতকে (দুনিয়ার) ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব মিটাব না।'[৩]

---

[2] দল উন্নয়নের মডেল এর পর্যায়সমূহ, ড. ব্রুস টাকমান, ১৯৬৫ ইং, Accessed at https://ns4business.com.br/tuckmans-stages-of-group-development

[3] আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫১৭২।

সাংগঠনিক দুর্বলতার ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক কারণগুলো কী কী এসব আমাদের বুঝা দরকার। আমার ভূমিকা কীভাবে সংগঠনের জন্য সহযোগিতামূলক হবে; যেখানে সংগঠন এখনো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অংশ হতে পারেনি। সংগঠনের দুর্বলতা দেখার আগে অলসতা আর দায়িত্বহীনতা যে আমার অস্থিমজ্জায় বিদ্যমান রয়েছে-এ বিষয়টি আমরা ভেবে দেখি না। আমরা-কর্মী সাধারণরা সামান্য কষ্টকর কিছু করতে হবে বুঝলে ভেঙে পড়ি, কীভাবে তা করতে হবে তা ভেবে পাই না। এজন্য সাংগঠনিক নেতৃত্ব আজ অসহায়ত্বের শিকার। সংগঠনে আমাদের সময় দেওয়া, অবস্থান, আদর্শ বা মেধার পরিমাণ বা সুযোগ সুবিধার কমবেশির কারণে সংগঠন শক্তিশালী বা দুর্বল হয়। আমাদের ভুলে গেলে হবে না যে, জগতের অবিস্মরণীয় সব কাজই বিভিন্ন পর্যায়ে সংগঠন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই হয়েছিল। তাদের মতোই যুগ-জিজ্ঞাসা ও দাবির উত্তর দেওয়ার জন্যই আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কোরাইশী রাহিমাহুল্লাহকে এই ভূখণ্ডে জমঈয়ত গড়ে তুলতে হয়েছিল। আজকে আমরা বিবেকের দায়িত্ব হিসেবে শুব্বানের সাথে আছি। আমরা হয়তোবা খুব আনন্দ পাচ্ছি না; তবুও শুব্বান করছি এ জন্য যে, এই পৃথিবীতে মানুষ যা করে তা তার যুগের দাবি মেটানোর জন্যেই করে। সাংগঠনিক প্রয়োজনের পথ ধরেই সারা দেশের সবখানে অসংখ্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়িক, ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গড়ে উঠেছে। এভাবে বিশাল জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এই দেশের মানুষের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিধান পরিপালনে শিরক, বিদআত, বদ্ধ ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারের যে আস্তর পড়েছে, ইসলামের উপর যে সমস্ত রসম-রেওয়াজ ও রীতিনীতি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তা দূর করে রাসূলুল্লাহর মৌলিক শিক্ষায় ফিরে যেতে চাওয়া সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর উপযোগিতা যেন দিন দিন বেড়েই চলছে। বিশুদ্ধ আকীদাহ-বিশ্বাস, আল কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে জীবন বিনির্মাণ, ধর্মীয় সংগঠনের সাফল্য-ব্যর্থতার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। আজ দেশ বা সমাজের প্রতি আমাদের যা-কিছু বক্তব্য, যা কিছু কথা তা কেবল সংগঠনের ভাষাতেই প্রকাশ্য। দেশের মানুষের জীবন যাপনের শিল্পকলা, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটছে না। তাই, সংগঠনের ভাষায় এই সংকটের উত্তর দেওয়ার প্রয়াসে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে ৩৭ টি জেলায়, যা থেকে ধীরে ধীরে পুরো দেশের ভেতর ছড়িয়ে পড়ছে।

একটা সংগঠন সফল হয় কয়েকটি কারণে। যথা: ১. সংগঠনের কর্মীদের সামনে একটি উজ্জ্বল ও অর্থপূর্ণ লক্ষ্য তুলে ধরতে পারলে; ২. সেই লক্ষ্যের দিকে তাদেরকে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বপ্নময়ভাবে জাগিয়ে তুলতে পারলে; ৩. এই উদ্যোগকে সক্রিয় রাখার মতো বস্তুগত সহযোগিতা নিশ্চিত করতে পারলে। এসবের সহযোগে কর্মীদলকে সুষ্ঠু উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হলে যে ফল পাওয়া যায় তা এর বহুগুণ বিচ্ছিন্ন মানুষের আলাদা চেষ্টা দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়। সংগঠন করার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝা যায় এখানেই ।

সংগঠনের জন্য ব্যবস্থাপনা একটি জরুরি বিষয়। ব্যবস্থাপনা হলো কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত কোনো গোষ্ঠীর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ। ব্যবস্থাপনা বলতে মানব সম্পদ, তথ্য-প্রযুক্তি ভাণ্ডার ও প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণকেও বুঝানো হয়ে

থাকে। ব্যবস্থাপনা বলতে সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকেও বুঝানো যেতে পারে যারা ব্যবস্থাপনা করে থাকে। এটা হতে পারে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা, পারিবারিক জীবনসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা বা পেশাগত দাপ্তরিক ব্যবস্থাপনা। দুইজন অংশীদার একসঙ্গে ব্যবসা করতে গেলে দুই বছরের মধ্যেই তা ভেঙ্গে যায় কেন? কেন আমাদের দেশের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত? কেন এত সংকীর্ণতা ও অসহিষ্ণুতা? সংগঠন সবার স্বার্থের দেখভাল করে। অথচ আমাদের মধ্যে ব্যক্তি স্বার্থের এমন সংকীর্ণ প্রবণতা রয়েছে, যা ছোট স্বার্থকে তৃপ্ত করতে পারলেও বৃহত্তর স্বার্থের জায়গায় ব্যর্থ করে দেয়। আমাদের ভেবে দেখা দরকার- আমরা যতটা সমষ্টিগত চিন্তা করতে পারছি তার চেয়ে কি বেশি আত্মগত? আমাদের কি ন্যায় নীতি নেই, সবার কল্যাণ কামনা নেই, পরার্থপরতায় কল্যাণকর কাজের ইচ্ছা নেই, সংগঠন করা কি কোনো জরুরি বিষয় নয়, চাকুরিজীবী ব্যক্তির কি সংগঠন করা উচিত নয়, মেধাবীদের কি সাংগঠনিক কাজে জড়ানো উচিত নয়? কেবল আমি আর আমার সংকীর্ণ স্বার্থ এই সীমিত চেতনার মধ্যেই কি আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি, আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থের সামনে জাতীয় উচ্চতর স্বার্থকে কি বিক্রি করে দিচ্ছি?

আত্মপরতা সাংগঠনিক দুর্বলতার একটি অন্যতম কারণ। সংগঠনের বাইরে বাস করা মানুষ সংগঠন কাঠামোর কোন্ তলে কখন কেন কোথায় তার অবস্থান তা সে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে না। নিজের বাইরেও তার ভাবনা বেশি দূর পর্যন্ত যায় না। আমাদের স্বভাবগতভাবে একা চলার অন্য একটি কারণ হতে পারে আমাদের দেশের মৃদুভাবাপন্ন আবহাওয়া ও জলবায়ু এবং খাদ্যের সুলভতা। বৈরী ও চরমভাবাপন্ন প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে যে মানুষদের টিকে থাকতে হয় সংঘবদ্ধতার চর্চা তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই জন্ম নেয়। সংঘবদ্ধতা না থাকলে তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। বাংলাদেশের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, উর্বর জমি, সহজলভ্য খাদ্য ও পানীয়র মধ্যে মানুষ সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন অনুভব করেনি বলেই আমাদের চরিত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রকতার একটি প্রবণতা দেখা যায়।

আমাদের ইতিহাসের কোনো পর্বে নিজেদের ভাগ্য আমরা নিজেরা বদলাইনি, আমাদের যেটা যা করার দরকার তা চিরকালই অন্যেরা করে দিয়েছেন। তাই কোনো কিছু করার কথা উঠলেই আমরা থমকে যাই। মনে করি কেউ যেন এসে তা করে দিবে। বাড়ির কাছে রাস্তার ঝোপঝাড় পরিষ্কার, ডোবা-নালা পরিষ্কার করার দরকার হলেও নিজেরা তা না করে স্থানীয় সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করি তারা যেন এসে আমাদের উদ্ধার করে। এটি আমাদের মানসিক দৈন্যতার চরম বহিঃপ্রকাশ।

সব দেশেরই সংগঠনগুলোর সাফল্য নির্ভর করে সেদেশের জনসাধারণের প্রকৃতি ও মনোভঙ্গির সঙ্গে সেগুলো কতটা সঙ্গতিপূর্ণ তার উপর। আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই কর্মোৎসাহহীন ও অবসাদগ্রস্ত। তারা সংগঠনকে কিছুই দেয় না; এর জন্য কিছুই করে না, কেবল এ থেকে পেতে চায়। যদি সত্যিই কিছু করে তবে তা একটাই-দ্বন্দ্ব আর কোন্দল। এই কোন্দলের ফলেই আমাদের সংগঠনগুলো ধীরে ধীরে শক্তিহীন ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। আমরা যদি আমাদের সাধারণ জনগণের ভাষা না বুঝি, কর্মীদেরকে না বুঝি; তাহলে কীভাবে আমাদের সংগঠন শক্তিশালী হবে?

স্মরণিকা

সংগঠনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বা নিজেদের শক্তির পাশাপাশি আমাদের দুর্বলতাগুলোও চিনে নেওয়া জরুরি। সংগঠনের একজন দায়িত্বশীল হিসেবে কর্মীদের মধ্যে "বিশ্বাস তৈরী", "বলা বা নির্দেশনা", "অংশগ্রহণ" বা "দায়িত্ব প্রদান" সূচকগুলোর নিরিখে ভেবে নিন যে আপনি কোন পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত। প্রতিটি পরিস্থিতির সাথে নেতৃত্বের ধরন (কন্ট্রোলার, এনালাইজার, প্রমোটর, সাপোর্টার) অনুযায়ী উপর্যুক্ত ৪টি বিকল্প কাজ রয়েছে যা আপনি করতে পারেন। যেমন বেশ কয়েকমাস যাবত আপনার দলের সদস্যদের কর্মদক্ষতা বেশ নিম্নমানের হয়ে পড়েছে। সদস্যরা মিটিং-এর উদ্দেশ্য নিয়ে তেমন সচেতন নয়। তাদের কাজ এবং দায়িত্বের বিষয়টি পুনর্গঠনের ফলে আগে কাজ হয়েছিল। তাদেরকে এখন বার বার মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য।

সম্ভাব্য পদক্ষেপ হতে পারে

আপনি...

ক. দলের সদস্যদের নিজেদের মতো করে দল পরিচালনার সুযোগ দিন।

খ. দলের প্রস্তাবনাগুলো একত্রিত করুন এবং দেখুন যে এগুলো উদ্দেশ্য পূরণ করছে কি না।

গ. দায়িত্ব ও কর্তব্য পুনর্গঠন করুন এবং সতর্কতার সাথে পরিচালনা করুন।

ঘ. দলের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণে সহযোগিতা করুন তবে খুব বেশি সরাসরি নয়।

ব্যক্তিগত নের্তৃত্বের ধরন বা বৈশিষ্ট্য (সিএপিএস মডেল[৪])

সি. (কন্ট্রোলার)- শক্তির দিকসমূহঃ বিচার ক্ষমতাসম্পন্ন, আস্থাবান, সুনির্দিষ্ট কাজ করে, প্রেরণামূলক, লক্ষ্যে স্থির।

দুর্বল দিকসমূহঃ স্পষ্টবাদী, কাঠখোট্টা, অস্থির, মতবিরোধকারী, উদ্ধত, চাপ প্রয়োগকারী, সমালোচনা গ্রহণ করতে পারেন না।

এ. (এনালাইজার)- শক্তির দিকসমূহঃ শান্ত, বিস্তৃত উপস্থাপনকারী, বিশ্লেষণী, পদ্ধতি মেনে চলেন।

দুর্বল দিকসমূহঃ বাধ্যকারী, অতিমাত্রায় বিশ্লেষক, মাঝে মাঝে সামজিকতা হারায়।

পি. (প্রমোটর)- শক্তির দিকসমূহঃ উদ্যমী, আবেগী, কর্মশক্তিসম্পন্ন, প্রচলিত ধারা মানেন না, সৃজনশীল।

দুর্বল দিকসমূহঃ যুক্তিবাদী, আবেগপ্রবণ, অগোছালো, নির্ভর করা যায় না।

এস. (সাপোর্টার)- শক্তির দিকসমূহঃ ভালো শ্রোতা, ইতিবাচক পরিবেশ তৈরী করেন, ভদ্র, বিশ্বস্ত।

দুর্বল দিকসমূহঃ অতিমাত্রায় সংবেদনশীল, না বলতে পারেন না।

---

[4] MDF, 'Leadership and People management manual' Accessed at: https://www.mdf.nl/courses-categories/leadership-and-people-management

নেতৃত্বের ধরন অনুযায়ী আপনি যে বৈশিষ্ট্যের অধিকারীই হোন না কেন, আপনাকে আপনার অধীনস্তদের প্রতি হতে হবে কোমল ও দয়াপরবশ। যেমনটি আল-কুরআনের সূরা আল ইমরান-এর ১৫৯ নং আয়াতে এসেছে- "হে রাসূল! এটা আল্লাহর বড়ই রহমত যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুব নরম মেজাজবিশিষ্ট হয়েছেন। আর যদি আপনি কঠোর স্বভাবের, রুক্ষ মেজাজবিশিষ্ট হতেন, তবে তাঁরা আপনার আশপাশ থেকে কেটে পড়ত। সুতরাং তাদের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন আপনি কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন তখন আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখবেন। আল্লাহ ওই সব লোকদেরকে ভালোবাসেন যারা তারই উপর ভরসা করে কাজ করেন।"

অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে পারস্পরিক সম্মানবোধ বজায় রেখে কাজ করা একজন নেতা-কর্মীর অন্যতম গুণ। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সবাইকে কাছে টানে আর নেতিবাচক মনোভাব সবাইকে তার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

কর্মীদের ধরন অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা

১. **উদ্যমী শিক্ষানবিস:** সদ্য যোগ দেওয়া কর্মী, অনভিজ্ঞ কর্মী, নূতন কাজ।

২. **হতাশ কর্মী:** ক্লান্ত, প্রভাবমুক্ত, মোহমুক্ত। দায়িত্বশীলরা অনেক সময় তাদের ব্যক্তিগত প্রত্যাশা কর্মীদের কাজে কতখানি প্রভাবিত করে তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। কেউ যদি উচ্চ কর্মক্ষম কর্মীকে দেখে, তবে তাঁরা সেই ব্যক্তির বিকাশের জন্য বিশেষ মনোযোগ দেন। বিপরীত দিকে এই দায়িত্বশীলগণ তুলনামূলকভাবে অসফল কর্মীকে ভালো সহকর্মী মনে করেন না। যার ফলে তাঁদের প্রতি কম মনোযোগ দেন এবং তা এই কর্মীদের নিরুৎসাহিত করে।

৩. **সক্ষম কিন্তু সচেতনভাবে অংশ নেয়:** কাজ করতে পারেন কিন্তু অনিরাপদ বোধ করেন, সফলতা দেখাতে ভয় পান।

৪. **স্বপ্রণোদিত:** স্বনির্ভর, আস্থা অর্জনকারী, স্বাধীন এবং অভিজ্ঞ কর্মী, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দায়িত্বশীলের আচরণ/পরিস্থিতি অনুযায়ী নেতৃত্ব (উপরে বর্ণিত কর্মীদের ধরনের ক্রমানুযায়ী)

১. **বলা (নির্দেশনা)**- কার্যকারণের ভিত্তিতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করুন। নির্দেশনায় একটি কাঠামো (কখন, কোথায়, কীভাবে) দেখিয়ে দিন, পরীক্ষামূলক প্রশ্ন করুন, তত্ত্বাবধান করুন।

২. **আস্থা তৈরী**- উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন, কাজের সঠিক সম্পাদন প্রক্রিয়ার উপর জোর দিন, প্রক্রিয়ার সংকট কী তা বের করুন, সমস্যা সমাধানে চিন্তা-ভাবনাগুলো জানতে চেষ্টা করুন, সম্পাদিত কাজের ভালো দিক এবং উন্নয়নযোগ্য দিক বলুন, একটি অঙ্গীকার-চুক্তিতে আসুন, যুক্তি তর্কের মাধ্যমে যথার্থতা আনুন, তার কাজের প্রশংসা করুন ও সবার সামনে তুলে ধরুন।

৩. **অংশগ্রহণ (কোচিং)**- সমস্যা খুঁজে নিন, মূল সমস্যাটি চিহ্নিত করুন, অনুভূতি দিয়ে বুঝার চেষ্টা করুন, সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন, সমস্যা সমাধানে সহায়তা করুন, সমাধানটি সন্তোষজনক কি না জিজ্ঞেস করুন, কাজের ইতিবাচক স্বীকৃতি দিন ও মূল্যায়ন করুন এবং উৎসাহ দিন।

৪. **দায়িত্ব প্রদান-** আপনি যে দায়িত্ব প্রদান করেছেন তা পরিষ্কার করুন, কোনো ফলাফল আনতে হবে তা স্বচ্ছ করুন, বুঝিয়ে দিন যে কেন আপনি তাকে কাজটি দিতে চান, দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করুন, শর্তাবলিতে একমত হোন, তথ্য দিন, আস্থা প্রকাশ করুন, নিজের কাজ, অংশগ্রহণ বুঁঝিয়ে দিন, মূল্যায়ন করুন, প্রণোদনা দিন, অন্যদের কাজ এবং কাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তা জানান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্ত করুন।

একজন দায়িত্বশীলকে তাঁর কর্মীদের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষেত্রে নিজের ধরনের (নেতৃত্বের স্টাইল) বিন্যাস জানা খুবই জরুরি। মূল বিষয়টি হলো কখন কোন ধরনটি ব্যবহার করতে হবে তা জানা। সাংগঠনিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা আপনাকে কোন পরিস্থিতিতে অনুসারীদের প্রস্তুতি বিবেচনা করে কোন আচরণ করতে হবে তা প্রকাশ করে। একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোন আচরণটি যথার্থ হবে তা বিবেচনা করুন। কোনটি কম সাফল্যের সম্ভাবনাসম্পন্ন কাজ তা বুঝার চেষ্টা করুন। যেকোনো পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে অনুসারীদের ইচ্ছা ও যোগ্যতা যথার্থভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন এবং সে অনুযায়ী আচরণ করুন। এভাবে আপনি কর্মীর কাজের জন্য প্রস্তুতি চিহ্নিত করার যোগ্যতা এবং যথার্থ নেতৃত্বের আচরণ করার ক্ষেত্রে আপনার সক্ষমতা উন্নয়ন করুন।

কোনো সংগঠন, দল বা গোষ্ঠীর আচরণ ও কাজকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্য অর্জনকেই নেতৃত্ব বলা হয়। নেতৃত্ব ছাড়া কোনো দল বা সংগঠন চলতে পারে না। প্রতিষ্ঠানে নেতাকে ঘিরেই অধস্তন জনশক্তি আবর্তিত হয়। তাই কার্যকর মানের নেতৃত্ব না থাকলে প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে কখনো কখনো আমাদের নেতৃত্বের ভূমিকায় আবার কখনো কখনো বা ব্যবস্থাপকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। এতদুভয়ের মাঝখানে পার্থক্য না বুঝলে ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হয়-

নেতা	ব্যবস্থাপক
নেতা হচ্ছেন তিনিই যিনি তার স্বপ্ন অন্যদের মাঝে এমনভাবে ছড়িয়ে দেন যেন তা সকলের স্বপ্নে পরিণত হয় এবং তারা তা অনুসরণ করতে শুরু করেন।	ব্যবস্থাপক হচ্ছেন তিনিই যিনি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে গাইডলাইন অনুযায়ী কর্মী ও সম্পদ ব্যবহার ও পরিচালনা করেন।
নেতা- সঠিক কাজটি করেন। অর্থাৎ নেতা তাঁর চিন্তাশক্তি ব্যবহার করেন। প্রয়োজনে প্রচলিত ব্যবস্থা বা অবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেন।	ব্যবস্থাপক- সঠিকভাবে কাজটি করেন। অর্থাৎ ব্যবস্থাপক কাজ করেন নিয়ম নীতিমালা অনুযায়ী।
নেতা- কৌশলগত দিকনির্দেশনা ও উৎসাহ দেন, উদ্যোগ গ্রহণ করেন, নতুন শিখন বিষয়ে উৎসাহ দেন।	ব্যবস্থাপক পরিকল্পনা ব্যাস্তবায়ন ও মনিটরিং করেন এবং অনেক বেশি মাত্রায় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।
নিজের শিখন থেকে অনুপ্রাণিত করেন, উদ্ভাবন করেন। অন্যদের জন্য উৎসাহব্যাঞ্জক। সংগঠনের মধ্যে এক ধরনের সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতি গড়ে তুলেন।	পথ অনুসরণ করেন, অন্যদের সহায়তা করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন এবং যে পরিবেশ বা সংস্কৃতি আছে তাতেই অবস্থান করেন।
কার্যক্রমের লক্ষ্য বর্ণনা করেন, যা মানুষের অনুভূতিগুলোকে সংযুক্ত করে এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে একটি স্বপ্ন প্রকাশ করে। কৌশল তৈরীর মাধ্যমে নেতৃত্ব দেন এবং ভবিষ্যতের সুযোগ তৈরী করার জন্য পরিবর্তনের পথে এগিয়ে নিয়ে যান।	কর্মপরিকল্পনা থেকে ফলাফল বের করার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করেন।
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। সমর্থক রয়েছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবেন।	কাজ কেন্দ্রিক। দাপ্তরিক কর্মী রয়েছে। বর্তমান সম্পর্কে জানেন।

আপনি কি নেতা, ব্যবস্থাপক নাকি দুটোই? কীভাবে আপনার নেতৃত্বর ধরন/বৈশিষ্ট্য আপনার ব্যবস্থাপনা কাজ এবং ভূমিকার সাথে জড়িত?

শরীআতে নেতার আদেশ মান্য করাকে নির্দেশ নির্ভর করা হয়েছে যতক্ষণ না তা আল কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর বিপরীত হয়। আদর্শ নেতৃত্বের ৫টি শৃঙ্খলা[৫] বা কাজ রয়েছে-

১. প্রচলিত ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেন- অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সুযোগ খোঁজেন, সৃজনশীল পথে চলতে চান, পরীক্ষা করে দেখেন এবং ঝুঁকি নেন, অনিবার্য ফলাফলকে শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেন।
২. সকলে মিলে স্বপ্ন দেখতে উৎসাহিত করেন। খুব গভীর অনুভূতি দিয়ে বিশ্বাস করেন যে, তিনি পার্থক্য তৈরি করতে সক্ষম, নিজের স্বপ্নের সাথে অন্যকে যুক্ত করতে সক্ষম হন, ভবিষ্যতের আকর্ষণীয় সম্ভাবনা দেখাতে সক্ষম হন।
৩. কর্মীদের আস্থা তৈরী করেন। সক্রিয়ভাবে সহযোগিতার বিষয়টিতে উৎসাহিত করেন এবং দলীয় উদ্দীপনা তৈরিতে ভূমিকা রাখেন, অন্যদের শক্তি ও সাহস প্রদান করেন, যাতে করে প্রতিটি ব্যক্তিই নিজেকে সক্ষম এবং শক্তিশালী ভাবতে পারেন।
৪. সামনে চলার পথ তৈরী করেন। অন্যদের জন্য অনুসরণীয় উদাহরণ তৈরী করেন।
৫. কর্মীদের হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করেন এবং উৎসাহিত করেন। প্রত্যেকের অবদানকে স্বীকৃতি দেন, তাদের চেষ্টার পুরস্কার প্রদান করেন যেন সহকর্মীরা নিজেদেরকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে পারেন।

মনে রাখতে হবে, একজন নেতা বা ব্যবস্থাপক হিসেবে কী করা যাবে, সেটা হলো আপনি কী ধরনের আচরণ অন্যের কাছে প্রত্যাশা করেন? আর কী করা যাবে না- সেটা হলো অন্যেরা যেরকমভাবে আচরণ করে।

পরিস্থিতি অনুযায়ী নের্তৃত্ব (আবেগীয়, বুদ্ধিমত্তা ও উন্নয়নযোগ্য দিক)
এমন একটি পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেন যেখানে আপনার কর্মী বা ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের বিষয়ে কোনো পরিস্থিতি সামলাতে আপনার জন্য কঠিন ছিল। কীভাবে আপনি ওই পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছিলেন? পরিস্থিতি অনুযায়ী নেতৃত্ব, আপনাকে সতর্ক করে আপনি কীভাবে পরিচালনা করবেন এবং এটি নির্ভর করে আপনার কর্মদক্ষতা ও পরিপক্কতা, অঙ্গীকার ও আস্থা, সহযোগিতামূলক ও সম্পর্ককেন্দ্রিক কিংবা নির্দেশনামূলক ও কাজকেন্দ্রিক আচরণ এবং কোনো কাজ করার জন্য আপনার দলের ইচ্ছার উপর।

কর্মীদেরকে কোনো কাজের কথা বলা বা নির্দেশনা দেওয়া এবং দায়িত্ব অর্পণ করা মানে- আপনি একজন দায়িত্বশীল হিসেবে 'নির্দেশাবলি' অথবা 'দায়িত্ব অর্পণ' যাই করেন না কেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে আপনাকে বিষয়টি স্বচ্ছ করতে হবে। সম্পূর্ণ বিষয়ের উপর একটি ধারণা দিয়ে আপনার প্রত্যাশাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে জানান।

[5] Peter M.Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization (New York: Doubleday/Currency, 1990).

নির্দেশনা এবং দায়িত্ব অর্পণ এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য:

বলা/নির্দেশনা	দায়িত্ব অর্পণ করা
বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়	কেন এই কাজটি গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়
বিশদভাবে বিষয়টি তুলে ধরা হয়	ফলাফল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়
বিস্তারিত আলাপ করা হয়	কর্তৃত্ব হস্তান্তর করা হয়
উদাহরণ দেওয়া/বিকল্প জানানো হয়	নূতন ধারণা যুক্ত করার সুযোগ থাকে
সময় সম্পর্কে একমত হয়	সময় সম্পর্কে একমত হয়
বোঝাপড়া ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে নেওয়া হয়	বোঝাপড়া এক কিনা পরীক্ষা করা হয়
-	সহায়তার প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং অন্যদের জানানো হয়।

বলার ক্ষেত্রে ধাপসমূহ: কাকে বলছেন তা নির্দেশনার মধ্যে নির্দিষ্ট করুন, আপনি কী বলতে চাইছেন তা ব্যাখ্যা করুন, সম্পূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরুন, তারপর আরো বিস্তারিত আলাপে যান, উদাহরণ এবং বিকল্প তুলে ধরুন, সম্পূর্ণ বিষয়টি স্বচ্ছ এবং নিখুঁতভাবে তুলে ধরুন এবং প্রশ্ন করে পরীক্ষা করুন বুঝেছে কি না?
দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে- কেউ কেউ ভিন্নভাবে কাজ করতে পারে এই সক্ষমতা স্বীকার করে নেওয়া। আমি সবচেয়ে ভালো পদ্ধতিটি জানি, আমি ভুল করা মেনে নিতে পারি না, আমি আমার কর্তৃত্ব অন্যকে দিতে চাই না, আমি আমার কর্মীদের উপর আস্থা রাখতে পারি না-এমন মনোভাব আদর্শ নেতৃত্বের সাথে যায় না। জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস, বাংলাদেশ একটি ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন। এর কর্মপন্থা হচ্ছে-একজন লিডার আরেকজনকে লিডার হিসেবে তৈরী করবে। এ জন্য আমাদের আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা (ইমোশনাল ইন্টিলিজেন্স) হচ্ছে- একজন ব্যক্তির নিজের এবং অন্যের আবেগীয় অবস্থা বুঝা এবং বিচার-বিবেচনা করে নিজের নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সক্ষমতা।[৬]

আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা কেন এতো গুরুত্বপূর্ণ

৫০ শতাংশেরও বেশি কর্মীর মধ্যে প্রতিনিয়ত শেখা এবং ব্যক্তিগত উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রে উদ্দীপনা কম দেখা যায়। প্রতি ১০ জনের ৪ জনই সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করতে পারেন না। ৭০ শতাংশের উদ্যোগ ব্যর্থ হয় মূলত কর্মীর বিষয় সম্পর্কিত ধারণার অভাব, নেতৃত্বের অভাব, দলীয় কাজ পরিচালনায় দক্ষতার অভাব, উদ্যোগ গ্রহণের অভাব এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়া মোকাবেলা করার অভাবে। তাই এটি সরাসরি সংগঠনের উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত।

[6] MDF, 'Leadership and People Management', Accessed at: https://www.mdf.nl/courses-categories/leadership-and-people-management

আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার মূল ক্ষেত্রসমূহ

ক) আত্মসচেতনতা- আমাদের আবেগ, সামর্থ্য, দুর্বলতা, প্রয়োজন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে গভীর বোঝাপড়া, নিজের প্রতি এবং অন্যদের প্রতি সৎ থাকা। এটি নিজেকে মূল্যায়ন করতে এবং নিজের আত্মবিশ্বাস তৈরী করতে সহায়তা করে।

খ) আত্মনিয়ন্ত্রণ- নিজের অনুভূতি, মানসিক অবস্থা এবং আবেগের উঠা-নামা ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারা, চ্যালেঞ্জের সাথে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা এবং নমনীয়তা থাকা। যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সে বিষয়ে চিন্তা করা এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখানো।

গ) সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা- দলের সদস্যদের সাথে একসাথে কাজ করার দক্ষতা। দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান, প্রভাবিত করা এবং উন্নয়ন করার সামর্থ্য থাকা।

ঘ) সামাজিক সচেতনতা- সহমর্মিতা, সাংগঠনিক সচেতনতা, অন্যের আবেগ অনুভূতি বুঝতে পারা এবং সেঅনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখানো। কোনো কর্মীকে নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে সচেতনভাবে আচরণ করা।

আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব

দলীয় কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়, নেতৃত্বের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, ব্যক্তিগত কল্যাণ বৃদ্ধি পায়, কার্যক্ষেত্রে চাপ কমিয়ে আনে, সংগঠনে সক্রিয় কর্মীর সংখ্যা বাড়ে, সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্তগ্রহণে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

যেভাবে আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা বাড়ানো যায়

প্রথম ধাপ- ব্যক্তিগত জীবনের লক্ষ্য বিবেচনা করে প্রেরণা আছে কি না তা পরীক্ষা করা।

দ্বিতীয় ধাপ- নিজের সামর্থ্যের দিক এবং উন্নয়নযোগ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে সৎ পরামর্শ পাওয়া, নেওয়া ও গ্রহণ করা। অন্যেরা আপনাকে কীভাবে দেখে সেটি সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা। একবারে একটি বিষয় নিয়ে উন্নয়নের কাজ শুরু করা।

তৃতীয় ধাপ- শিখন পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা।

চতুর্থ ধাপ- অন্য কারো কাছ থেকে সহায়তা নেওয়া। এটাকে শেখার সুযোগ হিসেবে দেখা, ব্যর্থতা হিসেবে নয়।

চূড়ান্ত ধাপ-স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগানো।

নের্তৃত্ব আমাদেরকে পরিচালিত করে। তারা আমাদের আবেগকে উদ্দীপ্ত করে এবং আমাদের ভেতরের সবচেয়ে ভালো বিষয়গুলোকে উৎসাহিত করে। যখন আমরা, কেন তারা সফল সেসম্পর্কে বলি, তখন তাদের কৌশল, স্বপ্ন এবং দৃঢ় ধারণার কথাই বলি।

কর্মীদের কাজের ফিডব্যাক বা প্রতিক্রিয়া

কর্মীদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ এবং প্রতিবার্তা (Feedback) প্রদান সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার একটি নিয়মিত অংশ। আপনার আচরণের ফলে অন্যের অনুভূতি কী এবং কী ধরনের প্রভাব অন্যের উপর

পড়েছে তা বুঝার একটি ভালো উপায় হচ্ছে ফিডব্যাক। কাজ করতে গেলে ভুল হবেই; তাই ফিডব্যাক শুরু করুন ইতিবাচক ও সুনির্দিষ্ট কথা দিয়ে যা সম্পাদনযোগ্য এবং বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, কাজের সাথে সম্পৃক্ত, ব্যক্তির সাথে নয়। ফিডব্যাক কখনোই পরামর্শ নয় (করা উচিত এটা বলা থেকে বিরত থাকুন), আচরণটি ঘটার পরপরই ফিডব্যাক দিন (সময়মত), শেষ করুন একটি ইতিবাচক বক্তব্য দিয়ে। ফিডব্যাক নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য সঠিক ব্যক্তিটিকে বেছে নিতে হবে, বুঝার জন্য জিজ্ঞেস করুন; কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া বা না নেওয়া আপনার উপর নির্ভর করে। মনে রাখবেন, ফিডব্যাক আপনার সম্পর্কে নয়, কাজের সম্পর্কে হবে।

উদাহরণ-

ব্যক্তি কেন্দ্রিক-এটা কি ফিডব্যাক? (নেতিবাচক)	বিষয় কেন্দ্রিক বা কাজের সাথে সম্পৃক্ত-গঠনমূলক (ইতিবাচক)
ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার অভাবের কথা জানায় যার প্রতি ফিডব্যাক নির্দেশিত হয়।	সমালোচনামূলক বা পর্যালোচনামূলক নয় বরং বর্ণনামূলক।
প্রায়ই প্রাপককে খারাপ, বিরক্তিকর বা অপরাধী মনে করতে পারে; তাঁর আত্মসম্মান হ্রাস করতে পারে।	এটা নিজেকে অন্যের জায়গাতে আগে রাখে তারপর জিজ্ঞেস করে 'আমি কীভাবে বললে অন্যের জন্য তা উপকারী হয়?'
আপনার লেখা প্রতিবেদনটি তেমন ভালো হয়নি।	আপনার লেখা প্রতিবেদনটি অনেক দীর্ঘ এবং যথেষ্ট তথ্যের অভাব ছিলো, ফলে আমি পড়তে বেশ অসুবিধায় পড়েছিলাম।
আপনার আরো ধীরে কথা বলা উচিত।	আপনি এত দ্রুত কথা বলেন যে, আমার বুঝতে সমস্যা হয়।
দুই সপ্তাহ আগে আপনি মিটিং-এ যেভাবে কথা বলেছেন তা ছিল আক্রমণাত্মক।	আমি দেখেছি, আপনি আজকের সকালের মিটিং-এ যেভাবে কথা বলেছেন তা আক্রমণাত্মক ছিলো।
আমি মনে করি না যে, আপনার ই-মেইলে দেওয়া উত্তর কার্যকর হবে।	আপনার কম্পিউটার ব্যবহার দক্ষতা সাধারণত ভালোই; যদিও আপনি ই-মেইল-এ উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশি দেরি করে ফেলেছেন।

দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা

আমাদের চারিদিকের অনেক কিছুই আমার মন মতো হয় না, হবেও না। নিজের মন মতো না হলেই মানসিক চাপ তৈরি হয়। তৈরি হয় দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব বলতে বুঝায় বিরোধ, দ্বিমত বা বিবাদ, যা দুইজন ব্যক্তির মাঝে, একই সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে অথবা দুই দলের মধ্যে সাধারণত দীর্ঘ সময়ের জন্য চলে। যেখানে অন্তত একজন নিজেকে বঞ্চিত ভাবতে পারে এবং হতাশা অনুভব করবে।

দ্বন্দ্বের ধরন

কার্যসম্পাদনের দ্বন্দ্ব- সংগঠনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যকার সম্পর্ক, পদ্ধতিগত বোঝাপড়া, ভূমিকা, বাজেট এবং কাজের দায়িত্ব ইত্যাদি।

পছন্দের দ্বন্দ্ব- ক্ষমতা, আদর্শ ও সম্পদ বিন্যাস ইত্যাদি।

সামাজিক ও আবেগিক দ্বন্দ্ব- অবস্থান, অনুভূতি, ব্যক্তিগত সম্পর্ক ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব কর্মক্ষেত্র এবং জীবনের অংশ। দ্বন্দ্ব কি 'ভালো' হতে পারে?

দ্বন্দ্ব তখনই ধ্বংসাত্মক যখন-	দ্বন্দ্ব তখনই গঠনমূলক যখন-
অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে যখন অন্যদিকে মনোযোগ বা শ্রম দিতে হয়।	কোনো বিষয়কে উন্মুক্ত করে এবং ব্যাখ্যা দেয়।
মূল্যের দিক থেকে যখন গভীর পার্থক্য তৈরী হয়।	পরস্পরকে শেখার সুযোগ করে দেয়।
সংগঠনের মধ্যে মেরুকরণ হয়ে যায়, ফলে সহযোগিতার পরিবেশ নষ্ট হয়।	কোনো কাজ বা প্রক্রিয়া নিয়ে পুনরায় নিরীক্ষা করা হয়।
কর্মীদের মাঝে নৈতিক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে থাকে।	ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।

দ্বন্দ্ব এমনভাবে নিরসন হওয়া উচিত যেন দ্বন্দ্ব আমাদেরকে পরিচালিত না করে। সঠিকভাবে দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনার জন্য অনুসন্ধান দক্ষতার প্রয়োজন হয়। দ্বন্দ্ব নিরসন করা যায় কখনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে- যখন আপনি আপনার অভিজ্ঞতা বলে জানেন যে আপনার সিদ্ধান্তটাই সঠিক; কখনো বা ক্ষমা করে- ভবিষ্যতের সম্পর্ক যেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, অন্যেরা যখন আপনার চেয়ে বেশি শক্তিশালী; কখনো বা এড়িয়ে যেয়ে-যখন ইস্যু এবং সম্পর্ক দুইটিই সমানভাবে গুরুত্বহীন, যখন 'থামিয়ে' দেওয়াই একমাত্র পথ এটি নিরসন করার জন্য; কখনো বা আপোষকামিতা করে-যখন উভয় পক্ষেরই সমান ক্ষমতা রয়েছে, ইস্যু বিবেচনায় উভয় পক্ষই গুরুত্বপূর্ণ, যখন উভয় পক্ষই কিছুটা ছাড় দিয়ে সমাধানে আসতে চায়; মুখোমুখি হয়ে- তখন উভয় পক্ষেরই আগ্রহের বিষয় থাকে, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, উন্মুক্ত মন, ও সৃজনশীলতা থাকে। সবচেয়ে ভালো ধরনটি হচ্ছে উভয় পক্ষকেই জিতিয়ে দেওয়া। 'আমি জিতি তুমি ঠকো, তুমি জিতো আমি ঠকি' এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে আমি জিতি তুমিও জিতো এই দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ দ্বন্ধ নিরসনে ভালো কাজ দেয়।

সংগঠন ও ব্যবস্থাপনায় সচেতনভাবে মনোযোগী হলে দায়িত্বশীল ও বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণগত পরিবর্তন হবে সর্বোতভাবে। সংগঠনের যেকোনো কর্মীর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি থাকা আবশ্যক। নেতৃত্ব হলো সেই গুণ, যা জনগণকে আরও কার্যকর ও দক্ষতার সাথে সেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয়। যিনি সংগঠন করেন তিনি অন্যের জীবনের সাথে নিজের জীবনের সম্পৃক্ততা অনুধাবন করেন। ব্যক্তিগত দক্ষতার উন্নয়ন ছাড়া কেউ ভালো সংগঠক হতে পারে না। সংগঠনের কোনো একজন সদস্য অন্যদের চেয়ে উন্নত জ্ঞান এবং দক্ষতার অধিকারী হতে পারেন, কিন্তু সংগঠনের সাফল্য নির্ভর করে কীভাবে একজন আরেকজনের সাথে মিলে দক্ষতার সাথে কাজের সমন্বয় করছেন এবং তারা তখনই সফল হবেন যখন একজোট হয়ে যে যার দায়িত্ব বুঝে নিয়ে কর্ম সম্পাদন করতে পারবেন। উন্নত মেধা, অন্তর্দৃষ্টি, মননসমৃদ্ধ নেতৃত্ব এবং শক্তিশালী সংগঠনের মধ্য দিয়ে অন্যকে সাহায্য করা ও জ্ঞানের প্রসারে শুব্বানের অবদান অব্যাহত থাকুক। দুর্বলতা ও অক্ষমতা এড়িয়ে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী জাতি গঠনে এগিয়ে যাক সম্মুখপানে।

৪র্থ দফা-

আত-তাদরীব ওয়াত্ তারবিয়্যাহ্ : আপডেট কর্মী গঠনের পূর্বশর্ত

মো. রেজাউল ইসলাম
সাবেক শুব্বান সভাপতি

আল-হামদুলিল্লাহ্, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু 'আলা রসূলিল্লাহ্ ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া মান তাবি'আহুম বি-ইহসানিন ইলা ওয়ামিদ্দীন।

ব্যক্তি ও সমাজ মানসের ইতিবাচক পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ তথা শুব্বানের কর্মসূচিতে দাওয়াত ও প্রচারের রূপরেখা এবং এর ব্যবস্থাপনার কলাকৌশলসমূহের কার্যকর ও সঠিক ধারায় প্রবাহিত করার জন্য নেতাকর্মীদের মধ্যে এগুলোর সঠিক চর্চা, লালন এবং প্রশিক্ষণ আবশ্যক। এ কারণে আত-তাদরীব ওয়াত্ তারবিয়্যাহ্ বা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ শুব্বানের চতুর্থ কর্মসূচী হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

সত্যিকার অর্থে ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনের রীতিনীতি ও পদ্ধতিগুলো কোনো একজন মেন্টরের তত্ত্বাবধানে রপ্ত করার প্রয়োজন হয়। যিনি একাধারে সৎ, সাহসী, আল্লাহভীরু, দক্ষ, দুই জাহানের বাস্তবতার উপলব্ধিসম্পন্ন, সমসাময়িক বিষয়াদিতে সচেতন এবং অনুসারীকে প্রভাবিত করার গুণসম্পন্ন হবেন।

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا[1].

শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের অনানুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক দু'টি দিক রয়েছে। একজন অনুসরণীয় নেতৃত্বের ভাল গুণগুলো পর্যায়ক্রমে অনুসারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে, Trickle down হবে। নেতা ও অনুসারীর এই মিথস্ক্রিয়া ইসলামী সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র। এমন অনেক বিষয় ও ক্ষেত্র আছে, যা কেবল অনুকরণ-অনুসরণের মাধ্যমে কর্মীর দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে। তাকে হাতে কলমে শেখানোর প্রয়োজন পড়বে। এজন্য আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণও সমভাবে দরকারী।

আজকাল বিশ্বব্যাপী প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার অনেক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বড় বড় প্রতিষ্ঠান তাদের Training & Development ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। আনুষ্ঠানিক অনেক Training centre গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকটা বড় বড় প্রতিষ্ঠানেরই প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা ইনস্টিটিউট রয়েছে।

যেসকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন:

নিচের কয়েকটি বিষয় মাথায় রেখে প্রশিক্ষণ কোর্স ডিজাইন করতে হবে:

১. বর্তমান সময়ে মুসলিমরা যেসকল চ্যালেঞ্জ, ইস্যু, নতুন ধারণা ও ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতার মুখোমুখি হয় সেসব সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা দেয়া।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য আধ্যাত্মিকতা, আর্থ-সামাজিক অবদান, সামাজিক ন্যায়বিচার ও স্থিতিশীলতার সাথে সম্পর্কিত করে মুসলিমদের আত্মপরিচয় তুলে ধরে এমন কোর্স আউটলাইন করা।

৩. নেতৃত্বের দক্ষতা ও প্রভাব সৃষ্টির ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সাংগঠনিক ও যোগাযোগের দক্ষতা বৃদ্ধি করে এমন সব কোর্স সংযোজন করা।

৪. নেতাকর্মীরা জীবনের অর্থনৈতিক, বিচারিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব রাখতে পারে এবং পারস্পরিক সমবেদনা ও ন্যায়নিষ্ঠার আন্তঃযোগাযোগ তৈরি করতে পারে এমন বিষয়সমূহ সম্পৃক্ত করা।

৫. প্রশিক্ষণগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যেন অংশগ্রহণকারীরা অভিজ্ঞ চিন্তাশীলদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পায়, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশলগুলো রপ্ত করতে পারে, কুরআন-সুন্নাহর নীতি ও ইসলামের মূল্যবোধ ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে শেখে।

প্রশিক্ষণ না নিলে কী হবে?

আমরা যদি আমাদের কাজের জন্য প্রশিক্ষণ না নেই তাহলে আমাদের কম সক্ষমতা নিয়েই কাজটি সম্পাদিত হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই সময়ের পরিক্রমায় তার কিছু অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা হারিয়ে ফেলে, যা উদ্ধার করার প্রয়োজন হয়। নতুন দক্ষতা ও জ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়ার দরকার পড়ে এবং সর্বোপরি কোনো কাজের দক্ষতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই আসে।

ইসলাম প্রশিক্ষণের নীতি ধারণ করে:

বিশ্বের ইতিহাসে স্বীকৃত যে, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে লালিত-পালিত ও প্রশিক্ষিত হবার কারণেই নবী ও সাহাবীদের সেই যুগ পৃথিবীর স্বর্ণযুগ ছিল। তাদের জীবনাচরণ, আমল-আখলাক ও প্রাত্যহিক কাজ-কর্মের ধরন খেয়াল করলেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা জীবনভর যেন একটা প্রশিক্ষণ সেশন অতিবাহিত করছিলেন। এই মর্ম উপলব্ধির জন্য নিচের কয়েকটি নমুনা পেশ করা যাক:

(ক) নাবী (সা.) ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকল সাহাবীকে যেকোনো আমল করার ক্ষেত্রে পূর্ণ মাত্রায় সঠিকতা আর আল্লাহর ধ্যান-জ্ঞানের শিক্ষা দিতেন যেন তারা এহসানের উপলব্ধি লাভ করতে পারে। আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন:

إن الله تعالى يحب إذا عمل احدكم عملا أن يتقنه .

আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তোমাদের কেউ কোনো কাজ করলে তা ভালোভাবে করবে। (বায়হাকী)[২]

(খ) তখনকার সময়ের মা-বাবা তাদের বালকদেরকে পৌরুষত্বের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এমনসব এলাকায় পাঠাতেন যেখানে এই ছোট শিশুরা বিভিন্ন দক্ষতা শিখতে পারে। এজন্য সেযুগে তীরন্দাজি, সাঁতার, ঘোড়সওয়ার, কুস্তি এবং দৌড় প্রতিযোগিতার মতো বিষয়গুলোর এতটা প্রসিদ্ধি ছিল। সালাফরা (রহ.) শিশুদেরকে এই সকল বিষয়ের প্রশিক্ষণের ওসীয়ত করতেন। ছোটবেলা থেকেই ইসলামী আদব আখলাক, মু'আমালাত ও কর্মদক্ষতার চর্চায় লালিত-পালিত হওয়াই ইসলামের তারবিয়্যাহ্। كنز العمال -

এর লেখক مكحول থেকে ওমর (রা.) এর বরাতে একটি اثر বর্ণনা করেন যে, ওমর (রা.) সিরিয়াবাসীদেরকে চিঠি লিখেছিলেন:

علموا اولادكم السباحة والرمي والفروسية

তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাতার, তীরন্দাজি আর ঘোড়সওয়ারী শেখাও। এই দক্ষতাগুলো প্রশিক্ষণ ছাড়া রপ্ত হয় না। একটি সংগঠনের সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা ধরে রাখতে হলে এবং তার সমজাতীয় সংগঠনের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে সংগঠনে সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণ আয়োজন জরুরি। সংগঠনে সময়ে সময়ে নতুন নতুন কর্মী সমর্থকের আগমন ঘটে। তাদেরকে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কর্মসূচি ও কর্মকৌশলের সাথে পরিচিত করানো দরকার হয়। নেতাকর্মী ও অফিস পরিচালনায় যুক্তদের ব্যবস্থাপনার কৌশল ও বাস্তবায়ন দক্ষতার উপর নিবিড় প্রশিক্ষণ দরকার হয়। শুধুমাত্র এই একটি ক্ষেত্রে অবহেলার জন্যই সংগঠনের অন্য অনেক চেষ্টার অসফল পরিসমাপ্তি ঘটতে দেখা যায়।

ইসলাম আধুনিক বিশ্বের ব্যবস্থাপনার কৌশল আর পদ্ধতিগুলো গুরুত্বের সাথে নেওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নকে ফোকাস করে প্রশিক্ষণের এজেন্ডা গ্রহণ করে, যেন আল্লাহর প্রতি ব্যক্তির বিশ্বাস পূর্ণতা পায়। যা সমসাময়িক আধুনিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলো এড়িয়ে চলে। ফলে কর্ম সম্পাদনের কলাকৌশল ও মেথডগুলোর সফল প্রয়োগ করে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের সফলতা আসলেও বৃহত্তর সামাজিক/রাষ্ট্রীয় কল্যাণ পূর্ণমাত্রায় অর্জিত হয় না। ব্যক্তির মানসিক ও মনঃদৈহিক তৃপ্তি সাধিত হয় না। যা ইবাদতের মাধ্যেমে অর্জিত হয়। এজন্য ইসলাম ইবাদতের প্রশিক্ষণের উপরও সমান গুরুত্বারোপ করেছে।

প্রশিক্ষণের জন্য বিনিয়োগ :

ইউনেস্কো ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যাটিসটিক্স (UIS) এর হিসাব মতে, ২০২০ সালে বিশ্বে সকল রাষ্ট্রের শিক্ষা খাতে গড় ব্যয় ছিল জিডিপির ৪.৩%; বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা মাত্র ২.১%, যা বিশ্বের গড়ের অর্ধেকেরও কম[৩]। ইসলামী সংগঠনগুলোতে বৃহৎ লোক সমাবেশ ঘটে এমন অনুষ্ঠানগুলোতে যত বেশি ব্যয় করা হয়ে থাকে তার তুলনায় প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার জন্য ঘনঘন প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যয় সৎসামান্যই। কম ব্যয়ের ছোট ছোট প্রশিক্ষণ সেশনগুলো দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে অভাবনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ধরনের আয়োজন যত ঘনঘন ঘটবে কর্মীর সাংগঠনিক ও কর্মের দক্ষতা তত বাড়বে। বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে আলাদা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট থাকে বা তারা এই আয়োজনের দায়িত্ব পালন করে। প্রতিষ্ঠান ভেদে সাধারণত মোট কর্মীবেতনের শতকরা ২ থেকে ৫ ভাগ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয় করা হয়ে থাকে[৪]। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত খরচ বাঁচানোর জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজনই করে না বা নামমাত্র ব্যয় করে।

প্রশিক্ষণ ব্যয় কমানোর উপায় :

আর্থিক সংকটে থাকে এমন ছোট ছোট সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলো প্রশিক্ষণ খাতে খরচ কমানোর জন্য নিচের উপায়গুলো অবলম্বন করতে পারে :

- গ্রুপভিত্তিক প্রশিক্ষণ ;
- নিজ সংগঠন/প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রশিক্ষক বাছাই;
- সাপ্তাহিক বা মাসিক মিটিংয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দান;
- সামান্য খরচে অনলাইনভিত্তিক অনেক প্রশিক্ষণ থাকে সেগুলোর সুযোগ নেয়া;
- কিছুদিন পরপরই নেতাকর্মী স্টাফদেরকে নতুন কোনো কাজের দায়িত্ব দিয়ে সর্বক্ষণ নতুন কিছু শেখার প্রতি আগ্রহী করে রাখা এবং
- সিনিয়র কোনো নেতা/কর্মীকে নতুনদের জন্য মেন্টরিং এর দায়িত্ব দেয়া।

উপসংহার:

নেতাকর্মী ও অফিসের স্টাফদের সংগঠনে ধরে রাখা, কর্মব্যস্ত রাখা, উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার জন্য ঘন ঘন প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। নিয়মিত ব্যবধানে প্রশিক্ষণ চালু থাকলে সংগঠনে প্রতিষ্ঠানের মনিটরিং ও সুপারভিশনে কম মনোযোগ ব্যয়িত হয়। কর্মীদের ভুল কম হয়, দীর্ঘ অনুপস্থিতি কেটে যায় এবং চারিদিকে কর্ম চঞ্চল একটি পরিবেশ বিরাজ করে। সাপ্তাহিক/মাসিক বৈঠক আর ঘন ঘন বাস্তবধর্মী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শুব্বান একদিন বাংলাদেশের নেতৃত্বে এগিয়ে আসার যোগ্য হয়ে গড়ে উঠবে ইন শা আল্লহ। তখনই সার্থক হবে আমাদের চতুর্থ দফা কর্মসূচি আত তাদরীব ওয়াত তারবিয়াহ : শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ ।

ولله التوفيق والمنة.

তথ্যসূত্র:

(১) সূরা আল ফুরকান-৭৪ অর্থ: দয়াময় আল্লাহর বান্দা তো তারা, যারা বলে, (হে আমাদের রব!) এবং মুত্তাকীদের জন্য আমাদিগকে অনুকরণীয় করুন।

(২) ইমাম বায়হাকী র. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। এরকম আরো অন্যান্য বর্ণনা থাকার কারণে আলবানী এটাকে الصحيحة তে সহীহ্ বলেছেন। صحيح الجامع ১৮৮০

(৩) Government expenditure on education, total (% of GDP) | Data (worldbank.org)

(৪) Training Budget 101: How to Effectively Manage Your Training Costs (efrontlearning.com)

৫ম দফা-

সমাজ সংস্কারের রূপরেখা: ইসলামী নির্দেশনা

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী
শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
অনুবাদক, রাজকীয় সউদী দূতাবাস, ঢাকা।

ভূমিকা: সংস্কার শব্দটি সংস্কৃত ভাষা হতে আগত। এটি বিশেষ্যপদ, যা নিম্নোক্ত অর্থগুলো প্রদান করে: শোধন, শুদ্ধি, পরিষ্করণ, অন্নপ্রাশন এবং উৎকর্ষসাধন, উন্নতিসাধন, মেরামত; ধর্মবিহিত অনুষ্ঠান; ধারণা, বিশ্বাস ইত্যাদি।[১] আমাদের সমাজে 'সংস্কার' একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। ইসলামে সংস্কার শব্দটি আরবী পরিভাষা অনুযায়ী 'ইসলাহ' (إصلاح) বা সংস্কার, পরিশুদ্ধি, সংশোধন ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২] আল কুরআনেও ইসলাহ শব্দটি বিভিন্ন সূরায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতীয় সংস্কারের বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছে। মূলত 'ইসলাম' ব্যাপক অর্থে সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনের জন্যই এসেছে। মানবজীবনের সমগ্রিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ইসলাম মানুষের আত্মিক বা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকসহ সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সর্বজনীন সংস্কারের নির্দেশনা দিয়েছে। সমগ্র মানবতার সার্বিক সংস্কারের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ একটি আদর্শ তাওহীদী ছাত্র ও যুব কাফেলা হিসেবে **১৯৮৯** সালে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলার জমীনে রহমাতুল লিল আলামীন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত ও সর্বকালের সেরা প্রজন্ম তদীয় সাহাবায়ে কেরামের অতুলনীয় আদর্শের অনুকরণে মধ্যপন্থী ও সর্বজনীন ইসলামী আদর্শ প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার তাওহীদী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। দীর্ঘ প্রায় সাত দশকেরও অধিক সময় থেকে সাংগঠনিক রূপে এর কার্যক্রম অবিরত ধারায় চলমান রয়েছে। জমঈয়তের অঙ্গসংগঠন হিসেবে শুব্বান এদেশের একটি আদর্শ ছাত্র ও যুবকাফেলা হিসেবে পরিচিত। শুব্বানের পাঁচ (৫) দফা কর্মসূচির সর্বশেষ দফা হচ্ছে ইসলাহুল মুজতামা বা সমাজ সংস্কার। উক্ত ৫ম দফা কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপস্থাপনই আলোচ্য নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

সমাজ সংস্কারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য: আরবীতে ইসলাহুল মুজতামা (إصلاح المجتمع) বা সমাজ সংস্কার অর্থ হচ্ছে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন। একে ইংরেজিতে আমরা Social Reformaion হিসেবেই জানি। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেওয়ার লক্ষ্যেই পৃথিবীর সূচনালগ্ন হতে দুনিয়ার মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কতক নির্বাচিত বান্দাকে দায়িত্ব প্রদান করে পাঠিয়েছিলেন।[৩] তাগুতমুক্ত একটি তাওহীদী সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল সেই মিশনের মূল লক্ষ্য। তাঁরা তাঁর প্রদত্ত নির্দেশনা

১। অনলাইন বাংলা অভিধান।
২। আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, ড. মুহাম্মদ ফযলুর রহমান।
৩। সূরা আন নাহল, আয়াত - ৩৬।

অনুযায়ী মানবজাতিকে সুপথে পরিচালিত করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।[৪] দুনিয়াতে শান্তি, শৃংখলা, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য তাঁরা ছিলেন নিবেদিত। তাঁদের তিরোধানের পর তাঁদের ওয়ারিস হিসেবে উলামায়ে কেরাম এ দায়িত্ব পালন করেছেন। পৃথিবীর সব যুগেই সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। অবিচ্ছিন্নভাবে অদ্যাবধি নবী-রাসূলদের এ মিশন এখনও চলমান রয়েছে। সমাজ সংস্কারের কর্মসূচি বন্ধ হয়ে গেলে মুসলিম সমাজে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, শিরক্ ও বিদ'আতসহ নানাবিধ জটিলতার আঁধারে নিমজ্জিত হয়ে গোমরাহীর সয়লাবে মুসলিমরা বিভ্রান্তির বেড়াজালে হাবুডুবু খাবে। সেহেতু সমাজ সংস্কারের কার্যক্রম অতীব গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যিক একটি বিষয়। ইমাম আব্দুল আযীয ইবনে বায রহ. বলেন, ইসলামী ও অনৈসলামিক উভয় ক্ষেত্রেই সমাজের সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে ইসলামী সমাজের সঠিক পথে চলার জন্য এটি একান্ত আবশ্যক।[৫]

সংস্কার বনাম কুসংস্কার: সংস্কার এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে কুসংস্কার। সংক্ষেপে এর অর্থ হলো, যুক্তিহীন বিশ্বাস বা অসার যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদে বিশ্বাস; এক কথায়–অন্ধবিশ্বাস। যুক্তিহীন ও অনৈতিক সামাজিক আচার-আচরণ।[৬] কারো মতে, চিরাচরিত ভ্রান্ত ধারণা বা বিশ্বাস, সামাজিক বা ধর্মাদি বিষয়ে যুক্তিহীন বিশ্বাস। ইংরেজিতে Superstition।[৭] বলা যায়, যেখানে কোনো বিষয় বা ঘটনা সত্য কি মিথ্যা, তা যাচাই করার মতো জ্ঞানের অভাব, সেখানেই কুসংস্কারের আস্তানা। অসভ্য, অর্ধসভ্য, অজ্ঞ ও শিশু মনেই কুসংস্কারের প্রভাব বেশি। মানব সমাজে কুসংস্কার এত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত যে, সম্পূর্ণ কুসংস্কারমুক্ত মানুষ খুব অল্পই পাওয়া যায়। অজ্ঞতা ও ধারণা হতেই কুসংস্কারের জন্ম হয় এবং তা ধীরে ধীরে সমাজে বিস্তৃতি লাভ করে। সংস্কারের চাইতে সমাজে কুসংস্কারের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা অতি দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়ে।

কুসংস্কারের উৎপত্তি ও বিকাশ: পৃথিবীর সূচনা হতেই মানবজাতির মাঝে মস্তিষ্কপ্রসূত ধারণার বশবর্তী হয়ে বহুবিধ কুসংস্কারের উদ্ভব ঘটেছে। মূলত, সমাজে প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কার মানুষের ধারণা প্রসূত বিষয়। এগুলোর কোনো ভিত্তি ও যৌক্তিকতা নেই। কুসংস্কারের ভিত্তি হচ্ছে- ধারণা প্রসূত চিন্তা-চেতনা ও অমূলক বিশ্বাস। এর অধিকাংশই প্রাচীনকালে উদ্ভাবিত পূর্ব পুরুষদের নিকট হতে চলে আসা কিছু রীতি-নীতি ও সংস্কৃতির অংশ। ইসলামী শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী যেমন তা সর্বক্ষেত্রেই পরিত্যাজ্য, বৈজ্ঞানিকভাবেও তা বর্জনীয়।

সংস্কারের মহানায়ক: ইসলাহ শব্দটি আল কুরআন ও সুন্নাহতে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে উল্লিখিত হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ মনোনীত দ্বীন মানুষের বিশ্বাস, আচরণ এবং সামগ্রিক পরিশুদ্ধির জন্য চয়ন করা হয়েছে। উক্ত শব্দটি আল কুরআনে প্রায় ৪০ বারের অধিক বর্ণিত হয়েছে এবং আরবি ব্যাকরণের ভিন্ন ভিন্ন প্যাটার্নে বর্ণিত হয়েছে। তবে চার অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের ক্ষেত্রে তা সংস্কার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। সূরা আল বাক্বারাহ, আয়াত - ৩০।
৫। আল্লামা ইবনে বাযের বক্তৃতা সংকলন। www.binbaz.org.sa
৬। বাংলা একাডেমী আধুনিক বাংলা অভিধান।
৭। বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান।

দুনিয়াতে সংস্কারের মহানায়ক হলেন- নবী ও রাসূলগণ। তাঁরা ছিলেন পৃথিবীর খালিক ও মালিক মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাঁদের সংস্কার কার্যক্রমের বিষয়গুলো দৃষ্টান্ত হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। যেমন নবী শুয়াইব আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে কল্যাণের পথে পরিচালনা করার জন্য তাঁদেরকে সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে -

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ **الإِصْلاَحَ** مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ هود: 88.﴾

অর্থ: তিনি বললেন: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আমি আমার রব প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে উত্তম রিযক দান করে থাকেন, (তবে কি করে আমি আমার কর্তব্য হতে বিরত থাকব?), আর আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি নিজে তার বিপরীত করতে আমি ইচ্ছা করি না।[৮] শুধু শুয়াইব আলাইহিস সালাম নন, সকল নবীই ছিলেন সংস্কারের অগ্রসেনানী। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আল কুরআনে সমাজ সংস্কারের নির্দেশনা: আল কুরআনে ব্যক্তি জীবন হতে শুরু করে পরিবার ও সমাজসহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে সংস্কারের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সূরা আল হুজুরাতে আল্লাহ তা'আলা বিবাদে জড়ানো মুমিনদের দু'টি দলের উল্লেখপূর্বক সীমালঙ্ঘনকারী দলের সঙ্গে কিতালের নির্দেশ দিয়েছেন যতক্ষণ না বিবাদ ও অশান্তি দূরীভুত হয় এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর সকল অবস্থায় তিনি মুমিনদের মাঝে ইসলাহের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি মহৎ কাজ।

আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

অর্থ: মুমনিগণ তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে আপোষ মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।[৯]

ইসলামী সভ্যতা ও সমাজ সংস্কার: পৃথিবীর ইতিহাসে যতগুলো সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছিল, তন্মধ্যে ইসলামই একমাত্র জীবনব্যবস্থা, যার আগমনে মানবজাতির বৈপ্লবিক সংস্কার ও সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হয়েছে। ইসলামী সভ্যতার বিকাশ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে শান্তির পয়গাম পৌঁছে গেছে। মানবরচিত ও মস্তিষ্ক প্রসূত ধ্যান-ধারণা হতে বেরিয়ে বিশ্ব মানবতা একটি অকাট্য দলীল-প্রমাণভিত্তিক জীবনব্যবস্থা পেয়েছে। যার মাধ্যমে মানুষের মাঝে আশরাফ-আতরাফের বিশাল ভেদাভেদ দূরীভুত হয়ে সকল মানুষ এক ও অভিন্ন স্তরের মর্যাদা লাভ করেছে। এভাবেই মানুষ মানুষের গোলামীর শৃঙ্খল হতে মুক্তি লাভে ধন্য হয়ে এক ও অদ্বিতীয় মাবুদের বান্দার মর্যাদায় আসীন হয়েছে। হাদীস

৮। সূরা হুদ, আয়াত - ৮৮।
৯। সূরা আল হুজুরাত, আয়াত - ১০।

শরীফেও প্রিয় নবীজি হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ-বিবাদ পরিহার করে সকল মুমিনকে এক আল্লাহর বান্দা হয়ে পরস্পর ভাই ভাই হিসেবে সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার উদাত্ত নির্দেশ দিয়েছেন।[১০]

আহলে হাদীস আন্দোলন ও সমাজ সংস্কার: মুসলিম স্কলারগণ আহলে হাদীস আন্দোলনকে ইসলাহ ও তাজদীদে দ্বীনের আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করেছেন। বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত, রহমাতুল লিল আলামীন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীন ইসলামকে যেভাবে রেখে গেছেন এবং উৎকৃষ্টপ্রাণ খোলাফায়ে রাশেদা ও সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে তা ধারণ ও লালন করেছেন, পরবর্তীতে তাতে নানান বিকৃতি ও বিচ্যুতি এসেছে। ইসলাম হতে মুসলমানদের বিচ্যুতি কেবল ফুরূ'য়ী বা শাখা-প্রশাখাগত ক্ষেত্রে নয় বরং তা অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক বিষয়েও ঘটেছে। মৌলিক আকীদাহ বিশ্বাসের বিচ্যুতি ও বিকৃতরি পথ ধরেই দ্বীনের মাঝে আবর্জনা জড়ো করা হয়েছে। তাওহীদ-শিরক, সুন্নাত-বিদ'আত, হালাল-হারাম ইত্যাদি মৌলিক বিষয়েও পরবর্তীকালের মুসলিম সমাজ এমনভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, যার কারণে প্রকৃত দ্বীন থেকে এ সমাজের অবস্থান হয়েছে বহু দূরে। সেই ঘড়ির মত এ সমাজের অবস্থা যার বাহ্যিক সাজসজ্জা ও আকৃতি সত্যিকার ঘড়ির মত হলেও ভিতরকার কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির রদবদল ঘটেছে প্রভূত। ফলে এর রূহ বা আত্মা হারিয়ে গেছে। আমাদের সমাজে মুসলমানেরা ঈমানের দাবি করে, নামায পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত দেয়, হজ্জ করে ঠিকই, কিন্তু তার প্রায় সবটাই যেন গড়ে ওঠে একটি গতানুগতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে। ইসলামের প্রকৃত আদর্শ তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের সাথে অনেক ক্ষেত্রে যার কোনো সঙ্গতি নেই।

সেজন্যই আমরা বিশ্বাস করি, কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে মানব সমাজ যদি দ্বীনের সামগ্রিক বিষয়গুলো পরিশুদ্ধির পূর্বে তাদের বিশ্বাস ও আচরণকে ঠিক করে নেয় তবে বিদ্যমান সকল দলাদলি ঘুচে যাবে এবং মুসলিম মিল্লাত এক ঐক্যবদ্ধ মিল্লাতে নবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। প্রাথমিকভাবে মুসলিম সমাজের এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে সকল সম্প্রদায়ের নিকট ইসলামের সেই দাওয়াত সেইভাবে পেশ করা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য যেমনটি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন। চিন্তার জগতে বিপ্লব সৃষ্টির মধ্য দিয়েই এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে। এটি সকল প্রচলিত ধারণাকে পাল্টে দেবে এবং মনে হবে নতুন কোনো দ্বীনের দাওয়াত এসেছে, যা একেবারেই অভিনব ও অশ্রুতপূর্ব। বাপ-দাদা, পূর্ব পুরুষের অনুসৃত দ্বীনের সাথে যেন এর সম্পর্ক নেই।

সমাজ সংস্কারের কাজটি খুবই কঠিন, তবে এতে সফলতা অর্জন করতে হলে পরিকল্পিত উপায় অবলম্বন আবশ্যক। পথ বড়ই বন্ধুর, এর বাঁকে বাঁকে আক্রমণের সম্ভাবনা, পদে পদে পা পিছলানোর আশঙ্কা, পরিবার থেকে বিতাড়িত হবার, সমাজে এক ঘরে হবার বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হবার সমূহ সম্ভাবনা এতে রয়েছে। পূর্ববর্ণিত চারদফা কর্মসূচী যদি ঠিকমত বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে এ দফার কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভবপর হবে।

সমাজ সংস্কারের মৌলিক সূত্র: মদীনার ইমাম হিসাবে খ্যাত মহামতি ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ সমাজ সংস্কারের একটি সোনালী সূত্র বর্ণনা করেছেন। তা হলো "এই উম্মতের শেষ প্রজন্মেও সংশোধন বা

১০। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং - ২৫৬৪।

সংস্কার একমাত্র সেই বিষয়ের মাধ্যমেই সম্ভব যার মাধ্যমে এর প্রথম প্রজন্ম সংশোধিত হয়েছিল।” অতএব ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সংস্কারের লক্ষ্যে ইমাম মালেক বর্ণিত সূত্রটি আমাদেরকে ফলো করতে হবে। যে সূত্র পরিপালনের মধ্য দিয়ে জাহেলী সমাজের মানুষগুলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিল, আমাদেরকেও সেই সূত্র আঁকড়ে ধরতে হবে। তবে সমাজ সংস্কার হতে হবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধাপে।

ইসলাহুল মুজতামা বা সমাজ সংস্কারের পর্যায়গুলো নিম্নরূপ

ক. ধর্মীয় ক্ষেত্রে গড়ে ওঠা মৌলিক আক্বীদাহ বা বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজ আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে পরিশুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়ে ব্যাপক দা'ওয়াত দিতে হবে। এক্ষেত্রে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সভা সমিতি, হ্যান্ডবিল, পোস্টার, পুস্তিকা ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

খ. সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, শিরক-বিদ'আত চিহ্নিতকরণ ও তা দূরীভূত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

গ. প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনৈসলামিক চরিত্র ও কর্মপদ্ধতি নির্দেশকরণ।

ঘ. ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও নীতিমালা বা ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপরেখা তুলে ধরা।

ঙ. বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক ও মানব হিতৈষী পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ।

চ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আপদকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত আর্ত-মানবতার উদ্ধারে আত্মনিয়োগ।

ছ. কোনো গ্রাম/অঞ্চলকে মডেল হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সার্বিক ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হওয়া, যাতে সেদৃষ্টান্ত অন্যত্র বিস্তার লাভ করে এবং উদ্বুদ্ধকরণে সহায়ক হয়।

জ. সমাজের অনৈসলামিক নেতৃত্বের নিকট খালেস ইসলামের দা'ওয়াত পেশ এবং মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে গুণগত নেতৃত্বের পরিবর্তনে কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ। আহলে হাদীস আন্দোলন ব্যক্তির অপসারণ চায় না– তার মন মানসিকতায় বিপ্লব সাধনের মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণগত পরিবর্তন চায়।

ঝ. মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তনের সাহিত্য-সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুসলিম সমাজে বিদ্যমান বিজাতীয় সংস্কৃতির স্থলে ইসলামী সংস্কৃতির প্রচলন করা।

ঞ. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিগৃহীত সমাজ সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ।

উপসংহার: সমাজ সংস্কারের কাজটি মূলত মানুষের জীবনের সামগ্রিক দিক ও বিভাগের জন্য। এটি শুধুমাত্র একটি বা কয়েকটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। এটি ব্যক্তিজীবন হতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। কাজটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এর বাস্তবায়নে ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ জরুরি। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মহলের সুচিন্তিত পরামর্শ এবং রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন মেনে এ কাজে অগ্রসর হতে হবে। তবেই সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মতের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই ইখলাসের সাথে সঠিকভাবে পালন করার তাওফীক দিন।

الموجز

في معرفة جمعية شبان أهل الحديث ببنغلاديش

-**عبد المتين**، السكريتر لشئون التعليم والبحث

بسم الله الرحمن الرحيم

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. رواه الترمذي، رقم الحديث : 2416 (حديث حسن)

أيها الشاب! ما هويّتك؟

إن الناس هم أحسن المخلوقات لله. وبجانب آخر هم عباده سبحانه وتعالى. و إن ما في الأرض من آلاء الله ونعمه هي للناس ويستفيدون منها عند الضرورة. لا يريد الله تعالى منهم إلا عبادته وحده مقابل ذلك. و العبادة هي العمل الأساسي للناس. ويقول الله (سبحانه وتعالي): "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" (سورة الذاريات، رقم الأية: 56) أي خلقتهم لأجل أن يعبدوني، فمن عبدني أكرمته ومن ترك عبادتي أهنته.

خلفاء الله المختارون في الدنيا

الناس لهم هوية فخورة مع المسئولية، هي أنهم خلفاء الله المختارون في البسيطة. وقول الله عز وجل:" وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" (سورة البقرة، رقم الأية: 30) أيْ : قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. فالناس لهم الواجب المستمر أن يتبعوا قوانين الله المنزلة حق الاتباع وينفذوها تنفيذا في جميع مراحل الحياة كل وقت. فالفوز والفلاح في الدنيا والآخرة يعتمد على امتثال هذه الواجبات والتوجيهات جيدا.

أمة سيد المرسلين وعضو الشعب الأحسن

قام جميع الرسل والأنبياء عليهم السلام بتأسيس توحيد الله وأوامره ونواهيه بين الناس الضالين، ونشروها في الأرض منذ الدهور. ومن هذا المنطلق وجدنا النظام الشامل للحياة و هو **الإسلام** الذي جاء به أفضل الناس خاتم النبيين نبينا محمد صلي الله عليه وسلم وهو دين الله أيضا. فالأمة المحمدية تقبلت الإسلام ولذلك أصبحت أكرم الأمم وأفضلها في العالم. يقول الله سبحانه وتعالي: "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ" (سورة آل عمران، رقم الأية: 110)

الأمة المحمدية شعب معتدل

وقول الله عز وجل:" وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً." (سورة البقرة، رقم الأية: 114) يقول الله تعالى : إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم (عليه السلام)، واخترناها لكم لنجعلكم خير الأمم ، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم ; لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال الله تعالى: "هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ." (الحج : 78)

السياسة العملية : اِتباع أحكام الله متحدا

في الحقيقة إن امتثال هذه الأحكام يحتاج إلى المحاولة المتحدة و اِتباع القرآن والسنة بإخلاص. وهذا أمر الله أيضا. قول الله:"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَ لاتَفَرَّقُوا" (سورة آل عمران، رقم الأية: 103) وقوله: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [النور: 63]؛ فكانوا أشدَّ بُعدًا عن مخالفة أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبعدهم عن الفتن.

النظام العملي: القرآن والسنة

حجة الوداع هي أول وآخر حجة حجها رسول الله محمد (صلي الله عليه وسلم) بعد فتح مكة، وخطب فيها خطبة الوداع التي تضمنت قيمًا دينية وأخلاقية، وعلمهم في خطبته فيها أمور دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها. وقد سمعها الآلاف من الصحابة. وكانت فيها وصية الرسول (صلى الله عليه وسلم) في الحث على التمسك بالكتاب والسنة:" (تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِيْ أَبَدًا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّتِيْ) رواه مالك في الموطأ: (1899/2)، والحاكم في المستدرك : (93/1)

وارث حضارة وحيدة

لا شك في أن الإسلام يدعو الناس إلى اِتباع القرآن الكريم والسنة النبوية بدون شروط. وهما أيضا دستور المسلمين الذين يرجون رحمة الله ورضاءه ومغفرته في الدارين. لقد وصل المسلمون في العهد الذهبي عهد الرسول والخلفاء الراشدين إلى قمة التقدم من الناحية الدنيوية والروحية بتقييم هذين الوحيين كما ينبغي. وكان المسلمون أسسوا في ذلك الوقت السلطنة الواسعة والحضارة السامية على ضوء التوحيد والسنة. ونحن وارثون لتلك الحضارة.

أهل الحديث: الحرس الساهر لدين الحق

أهل الحديث لفظ مركب ولكن من جوامع الكلام الذي يدل على متبعي القرآن والآحاديث الصحيحة. أهل الحديث هم حزب من المسلمين الذين يتمسكون بالقرآن والسنة بنواجذهم في جميع مراحل حياتهم ويفضلونهما على سائر النظريات التي ألفها البشر. كما أنهم يتبعون أسوة الصحابة والتابعين الذين كانوا من جيل خير القرون. هم من نَهَج نَهْج الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وتقديمهما على كلِّ قول وهدى، سواء في العقائد، أو العبادات، أو المعاملات، أو الأخلاق، أو السياسة والمجتمع. فهم ثابتون على ما أنزله الله وأوحاه على عبده ورسوله محمد (صلى الله عليه وسلم). وهم القائمون بالدعوة إلى ذلك بكل جد وصدق وعزم، وهم الذين يحملون العلَم النبوي، وينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. فهم الذين وقفوا بالمرصاد لكل الفرق التي حادت عن المنهج الإسلامي، كالجهمية، والمعتزلة، والخوارج، والروافض، والمرجئة، والقدريّة، وكلّ من شذّ عن منهج الله واتبع هواه في كلِّ زمان ومكان، لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهم الطائفة التي مدحها رسول الله (صلى الله عليه وسلم). وزكاها بقوله:" لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا مَن خالفهم حتى تقوم الساعة" هم الفرقة الناجية الثابتة على ما كان عليه رسولُ الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه، الذين ميّزهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحدّدهم عندما ذكر أن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقيل: مَن هم يا رسول الله؟، قال: "مَن كان على ما أنا عليه وأصحابي." لا نقول ذلك مبالغةً ولا دعوًى مجرَّدة، وإنما نقولُ الواقع الذي تشهد له نصوصُ القرآن والسنة، ويشهد له التاريخ، وتشهد به أقوالهم، وأحوالهم، ومؤلفاتهم. وهم معروفون عند المفكرين المسلمين بأهل الحديث وأحيانا بأصحاب الحديث وأحيانا بالمحمدي و أحيانا بالسلفي.

لا بد أن تفكر

إن الدنيا تقتل ما ترغب فيه وتطلبه. لأنها تغرك بحيث تنسيك. أنها مكان ضيق سترحل عنها قريبا جداً، ولن تبقى بها طويلاً وتنسى أن تتزود للسفر الطويل وهو الآخرة التي هي المقر الأخير. ولتسئلن يوم الحساب المفزع عما فعلت في حياة الدنيا ولو كان مثقال ذرة. لا ينفعك أحد إلا أعمالك الصالحة. فالمؤمنون الصالحون في ذلك اليوم يدخلون الجنة التى هي دار السعادة والترف. ويدخل المجرمون جهنم و هي مكان تعذيب وانتقام الله من الكافرين وممن عصاه و يدخلها من كتب عليه الله الشقاء بعد الحساب يوم القيامة. فتفكر أيها الشاب هل أعمالك تنجيك ذلك اليوم أم تكون من أهل النار؟

جمعية شبان أهل الحديث في بنغلاديش: تسلسل تاريخي

كانت حركة أهل الحديث مستمرة و بعدم المصالحة لقمع الشرك والبدعة وإعلاء علم الإسلام يرفرف على جميع النظريات البشرية في كل دولة منذ العصور. وهذه الحركة مست صعيد شبه القارة الهندية. يرجع تاريخ أهل الحديث في شبه القارة الهندية إلى العهد الإسلامي الأول حيث استضاءت بعض مناطق الهند بنور الإسلام بجهود التجار والمجاهدين العرب. وفي أواخر القرن الرابع بدأ الضعف يدب في نشاط أهل الحديث وقد بلغ منتهاه في القرن التاسع الهجري، نظراً لانتشار الخلافات السياسية والعصبية، وظهور فتنة الباطنية الإسماعيلية التي جرت على أهل السنة الفتن والمشاكل، فقل الاهتمام بالسنة، وفشا التقليد والتعصب للمذاهب ، والجمود عليها، وسادت علوم اليونان. ومع هذا كله وجد في شبه القارة الهندية عدد من علماء أهل الحديث من تلاميذ الحافظ بن حجر العسقلاني والإمام السخاوي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وغيرهم، حيث ظلوا محافظين على منهج أهل الحديث. مع بداية القرن الحادي عشر الهجري بدأ دور جديد لأهل الحديث حيث ظهرت في عصر الشيخ أحمد السرهندي ، وقويت في عهد أنجال الإمام شاه ولي الله المحدث الدهلوي وبخاصة ابنه الكبير شاه عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي حيث استفادوا من منهج ابيهم في الدعوة والإرشاد والتدريس والإفادة والتأليف، ونبذ الجمود والتعصب المذهبي، وزادت قوتها وانتشارها في عهد حفيده الإمام إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي قائد الدعوة والجهاد وصاحب كتاب تقوية الإيمان. وبعد استشهاد الإمام شاه إسماعيل الدهلوي المعروف باسم إسماعيل الشهيد في معركة بالاكوت (في باكستان الحالية) تحمل أهل الحديث مسؤولية الدعوة والجهاد بكل أمانة وإخلاص، وكانت جهودهم في هذه الفترة مرتكزة على ثلاثة ميادين رئيسية: ميدان الجهاد وميدان التأليف و ميدان التدريس. وفي عام 1906م قرر علماء أهل الحديث برئاسة شيخ الإسلام أبي الوفا ثناء الله الأمرتسري تشكيل جمعية لهم تقوم على نشر الدعوة على منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ومقاومة الحركات الهدامة ومواجهة تحديات العصر تحت اسم (مؤتمر أهل الحديث لعموم الهند). العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي تولى رئاسة الجمعية بعد مؤتمر 1946م، وفيه اختير اسم جديد بنخيل بنغو آسام جمعية أهل الحديث،(جمعية أهل الحديث في عموم البنغال و آسام) وتولى الأمانة العامة مولى بخش الندوي وعقد أكثر من مؤتمر أقر فيها الدستور، والمناهج والبرامج، واتخذ قرار تأسيس الجمعية على مستوى المناطق والمحافظات. وتحت إشرافه أيضاً تم إصدار مجلة 'ترجمان الحديث'. والدكتور محمد عبد الباري تم انتخابه رئيساً للجمعية بعد وفاة العلامة محمد عبد الله الكافي عام 1960م، وتولى الشيخ محمد عبد الرحمن الأمانة العامة، وبرئاسة تحريره بدأت تصدر مجلة 'عرفات الأسبوعية'، وحتي الآن تصدر، وفي عهده واجهت الجمعية صعوبات عديدة بعد انفصال باكستان الشرقية عن الغربية عام 1971م وفيه تم تعديل اسم الجمعية إلى جمعية أهل الحديث بنغلاديش . وتم تشكيل **جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش** تحت ظل **جمعية أهل الحديث بنغلاديش** في

مؤتمر انعقد بتاريخ 28 ديسمبر عام 1989م في أشهر المساجد من عاصمة داكا. وهذه المنظمة توصل دعوة الكتاب و السنة إلى شباب بنغلاديش من جهات شتى.

الهدف والغرض والبرنامج لجمعية شبان أهل الحديث في بنغلاديش

الهدف والغرض: الشعور بالكلمة " لا إله إلا الله محمد رسول الله" شعورًا صحيحا ثم الحصول على رضاء الله بتأسيس القرآن والسنة في جميع مراحل الحياة.

و هناك برنامج متكون من خمس نقاط لتنفيذ هذا الهدف والغرض للشبان:

- **إصلاح العقيدة:** العلم الصحيح حول التوحيد والرسالة المحمدية وممارستهما، والحث على العبادة بالإخلاص، وإنشاء العقل ليتخذ سيادة النبي (صلي الله عليه وسلم) بالقلب والحقيقة ثم تنفيذها في جميع أمور الحياة.
- **الدعوة والتبليغ:** إيصال الدعوة الإسلامية الصحيحة إلى الطلبة وجماعة الشباب وجعلهم مسلمين مخلصين.
- **التنظيم والإدارة:**دعوة الطلاب و مجتمع الشباب إلى الإسلام و تنشئتهم كمسلمين تنشئة حقيقية.
- **التدريب والتربية:** تعليم الشباب مبدأ أساسيا للإسلام ليوحدهم، وبالنظر إلى قمع الشرك والبدعة وتلك الأهداف جعل الناشطين من الشباب قادرين على أن يأسسوا حركة أهل الحديث ويوسعوها في جميع طبقات المجتمع تحت قيادة جمعية أهل الحديث في بنغلاديش.
- **إصلاح المجتمع:** بذل جهود شاملة لتأسيس المجتمع على ضوء القرآن والسنة بعد مقاومة العادات والتقاليد التي لا يعترف بها الإسلام و إزالة الخرافات التي تدمّر المجتمع.

السياسة العملية وأسلوب العمل للمنظمة

"جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش" منظمة تعمل بالحمكة وأنشطتها هي الطريق العادي. لا مكان فيها للتطرف والمصالحة بل الطريق المعتدل هو سياسة المنظمة. ومع ذلك أُخذت الأساليب المؤسسية والحقيقية لإنشاء الزعامة اللائقة الصالحة، وهي تمهد طريق الترقية للناشطين. مراحل الناشطين للمنظمة أربع:

أولا: الراغب

ثانيا: العارف

ثالثا: السالك

رابعا: الصالح وهو أعلى المراحل.

لترقية الناشطين يعتبر العلم من حيث المنهاج الدراسي والعملي. وطبقات المنظمة وهي أيضا أربع:

الأول: الفرع

الثاني: مفخر الشرطة أو شبه المحافظة

الثالث: المحافظة

الرابع: المركز.

جميع الأعمال للشبان تتم إدارتها وتنفيذها طبقا للهيكل التنظيمي وأسلوب العمل والمنهج الدراسي المعين أُلِّف على ضوء القرآن والسنة. الشبان لا يعملون لاتباع جزء الإسلام الخاص أو فرعه المحدد بل هم يعملون للمحافظة على الإسلام الكامل. ومع ذلك، فإنهم يسعون دائما لتقوية الاتحاد الإسلامي بتأسيس العلاقة الأخوية والودية مع جميع المنظمات الإسلامية والدينية. وحركة الشبان تبحث عن الجذر والأصل، وحركتهم عدم المصالحة في مقاومة الثقافة الخبيثة السائدة في المجتمع الإسلامي.

دعوتنا

اليوم دخل سكان العالم في العصر الجديد بعد مضيئ ألفي سنة ذات زاخر بالأحداث. تتقدم العلوم والفنون والتكنولوجيا بالتدرج كأنها تناطح السحاب. فالعالَم مزدهر بالتطوير والامتياز ماديا وعلى الرغم من ذلك اليوم فإن إنسانية العالم منهزمة بالأزمة الروحية. فلسفة الحياة العلمانية الغربية والثقافة الوخيمة مسئولة عن هذه الحالة. ولانهاء هذا الحال تجري الحركة السلفية عبر العالم لتنفيذ القرآن والحديث النبوي في جميع طبقات الحياة الشخصية والاجتماعية والدولية. **فجمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش** تبذل جهودها لتأسيس نفس الحركة في وطننا العزيز بنغلاديش تحت ظل سيادة **جمعية أهل الحديث بنغلاديش**. فموج النهضة الإسلامية الذي يجري في العالم هو يدعو مواطني العالم إلى الأمن والسلامة والسعادة والصراط المستقيم. فنحن ندعو بوضوح جماعة الشباب من بلادنا إلى الاجتماع في نفس القافلة للحصول على النجاة في الدنيا والآخرة.

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাকাল: ২৮-১২-১৯৮৯

কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দের কার্যকাল

ক্র: নং	সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক	সেশন
০১.	মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম (আহ্বায়ক)	গোলাম কিবরিয়া নূরী (যুগ্ম আহ্বায়ক)	১৯৮৯-১৯৯৪
০২.	গোলাম কিবরিয়া নূরী (আহ্বায়ক)		১৯৯৪-১৯৯৯
০৩.	মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম	এজাজুল হক	১৯৯৯-২০০২
০৪.	ইফতিখারুল আলম মাসউদ	মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন	২০০২-২০০৪
০৫.	ইফতিখারুল আলম মাসউদ	মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন	২০০৪-২০০৬
০৬.	মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম	সাইদুর রহমান (রহিমাহুল্লাহ)	২০০৬-২০০৮
০৭.	মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন	নূরুল আবসার	২০০৮-২০১১
০৮.	নূরুল আবসার	ফারুক আহমাদ	২০১১-২০১৭
০৯.	মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী	মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক	২০১৭-২০১৯
১০.	মোঃ রেজাউল ইসলাম	মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক	২০১৯-২০২১
১১.	ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী	রবিউল ইসলাম	২০২১- ২০২৩

সুপ্রিয় শুব্বান! সংগ্রামটা চালিয়ে যান

মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম
সাবেক শুব্বান সভাপতি

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

প্রশংসা শুধুই মহান আল্লাহর জন্য যিনি সকল সৌন্দর্য, সদগুণ এবং নি'আমাতের মালিক। আর আমাদের শ্রদ্ধা-সালাম এবং দরুদ সর্বকালের সেরা মানুষ, সাইয়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.-এর জন্য।

অতঃপর সুপ্রিয় শুব্বান ভাইয়েরা! আজ আমি কিছু নসীহা পেশ করছি, যা আপনাদের পথ চলায় সহায়ক হবে বলে আশা করছি।

আপনারা জানেন, পার্থিব জীবন মূলত সংগ্রামমুখর। শান্তি এবং স্বস্তির জায়গা হলো জান্নাত। সেটিই আমাদের আসল বাসস্থান। ঈমানী পরীক্ষার অংশ হিসেবে আমরা পৃথিবীতে এসেছি। জান্নাত থেকে চলে আসার কারণে আমরা বেশ ভয় এবং দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছি। আমরা আবার জান্নাতে ফিরে যেতে পারবো তো? না-কি নিক্ষিপ্ত হবো সীমাহীন শাস্তির ভয়াবহ স্থান জাহান্নামে? শয়তানের ষড়যন্ত্রের শিকার প্রথম মানুষ আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম এবং আদি মাতা হাওয়া আলাইহাস সালামকে পৃথিবীতে পাঠানোর প্রাক্কালে এ প্রশ্নটাই তাদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল বার বার। ওই সময় আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন এ ক্ষেত্রে সফল হবার মূলমন্ত্রও বলে দিয়েছিলেন এভাবে–

﴿قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾

"তোমরা সবাই এ (জান্নাত) থেকে (পৃথিবীতে) নেমে যাও। এরপর আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যখন কোনো হিদায়াত আসবে, তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই। আর তারা দুঃখীও হবে না।" (সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ৩৮)

এ থেকে বুঝা যায়, মহান আল্লাহর দেয়া হিদায়াত দ্বীন ইসলাম অনুসরণ করলে আমরা কোনো ভয় এবং দুশ্চিন্তা ছাড়াই আবার জান্নাতে ফিরে যেতে পারবো। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম নিদর্শন হলো জান্নাত। প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে তিনি শান্তি এবং স্বস্তির জায়গাতেই রাখতে চান।

সুপ্রিয় ভাইয়েরা! মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির চাদরে আচ্ছাদিত জান্নাতে থাকার বা সেখানে ফিরে যাবার বিষয়টিও কষ্টসাধ্য, সংগ্রামমুখর। সংগ্রামটা শুরু হয়েছিল আদি পিতা আদম (আ.) জান্নাতে থাকার সময় থেকেই। প্রথম সংগ্রামটা ছিল 'ইল্‌ম বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অসীম অনুগ্রহে মানব জাতির মূখ্যপাত্র আদম (আ) এ ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছিলেন। শয়তান তো বটেই, ফেরেশ্‌তারাও জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানব জাতির এ শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করতে পারেনি। সৃষ্টিগত উপাদানের দোহাই দিয়ে শয়তান অহংকার প্রদর্শন করলেও 'ইল্‌মের শ্রেষ্ঠত্বই মহান আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়। কাজেই জান্নাতে ফিরে যাবার সংগ্রামী মানুষের প্রধান অস্ত্রই ওহীভিত্তিক 'ইল্‌ম। এ কারণে শুব্বানের প্রতিটি স্তরে 'ইল্‌ম চর্চার গতি বৃদ্ধি করতে হবে। জনশক্তির মানোন্নয়ন এবং তাদের ক্রমোন্নতির জন্য

সিলেবাসভিত্তিক পড়াশুনা, নিয়মিত মূল্যায়ন এবং প্রাত্যহিক জীবনে তার বাস্তবায়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

সুপ্রিয় ভাইয়েরা! আপনাদের আজ দশম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে আমরা ২ জন আহ্বায়ক এবং ৯ জন নির্বাচিত সভাপতির নেতৃত্বে ৩৩টি বছর পার করেছি। ব্যর্থতা কিছু আছে। সফলতার ভাণ্ডারও একেবারে শূন্য নয়। দিন দিন আমরা সমৃদ্ধ হচ্ছি। সারা দেশে শুব্বানের এক বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে। অভিভাবক সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্বেও আমাদের সাবেক দায়িত্বশীল ভাইয়েরা দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। অনলাইন-অফলাইন দাওয়াতী কাজ, সৃজনশীল প্রকাশনা, গণমুখী দাওয়াত এবং মানবিক কার্যক্রমেও শুব্বান বেশ অগ্রসর। ফা লিল্লাহিল হামদ। তবে মনে রাখতে হবে, এতটুকু সাফল্যে আমরা যেন আত্মতুষ্টি এবং আত্মতৃপ্তির মায়াজালে আবদ্ধ না হই। কারণ, আমাদের সংগ্রাম এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং মানবিক ও আধ্যাত্মিক বিপর্যয়ের তুলনায় এ সাফল্য তেমন কিছুই নয়। সঠিক দ্বীন ও মানহাজের মুজাহিদদের সাফল্যের মনজিল এখনও বহুদূর!

সংগ্রামী ভাইয়েরা! আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে, মানুষের কাছে পরাজিত হয়ে অহংকারী শয়তান মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির শিকার হয়েছিল। বহিষ্কৃত হয়েছিল জান্নাত থেকেও। তবুও মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিল–

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.

“হে আমার প্রভু! আমাকে আপনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিন।”

(সূরা আল হিজ্‌র ১৫ : ৩৬; সূরা সোয়াদ ৩৮: ৭৯)

আল্লাহ তা'আলা তার প্রার্থনা কবুল করার পর সে আরো বলেছিল–

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (35) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (38) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.

“তিনি বললেন, তাহলে তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, তুমি বিতাড়িত। আর নিশ্চয়ই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তোমার উপর লা'নত। হে আমার প্রভু! আমাকে আপনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিন। তিনি বললেন, তুমি নিশ্চয়ই অবকাশপ্রাপ্তদের একজন। নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত। হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তেমনি তাদের (অর্থাৎ- মানুষদের) সবাইকে পৃথিবীতে নানা রকম সৌন্দর্যে প্রলুব্ধ করবো এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেবো। তবে যারা আপনার একনিষ্ঠ বান্দা, তাদের ব্যতীত।” (সূরাহ্ আল হিজ্‌র ১৫ : ৩৪-৪০; সূরা সোয়াদ ৩৮ : ৭৭-৮৩)

ইবলিশ শয়তান তার চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের দৃঢ় ইচ্ছা নিয়েই পৃথিবীতে এসেছে। মানুষের রগ-রেশায়, চিন্তা-চেতনায় প্রবেশ করে মানব সমাজে বিপর্যয়ের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। উপরন্তু, তার ধোঁকায় পড়ে বিভ্রান্ত কিছু

মানুষও তার সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এ শয়তানী শক্তিকে 'খান্নাস' বলে অভিহিত করেছেন :

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

"কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে (আশ্রয় চাই), যে দ্রুত আত্মগোপন করে। যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। জিন্ এবং মানুষের মধ্য থেকে।" (সূরা আন্ নাস ১১৪ : ৪-৬)

কাজেই আমাদের যুদ্ধটা শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে। জিন্-শয়তানের পরিচালনায় বিভ্রান্ত মানুষ ও শয়তানের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম অবিরাম। জান্নাত থেকেই তা শুরু হয়েছে; আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে চলমান।

সুপ্রিয় ভাইয়েরা! শয়তানী শক্তি নানান কৌশলে সমগ্র মানব সমাজে তার ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ মানুষকে কুফ্রীতে নিমজ্জিত করেছে। আহলে কিতাবদেরকে অহংকারের মায়াজালে ফেলে ইসলাম থেকেই দূরে সরিয়ে রেখেছে। তাদেরকে কুফুরী শক্তির সহায়কে পরিণত করেছে। আমাদের মুসলিম সমাজও শয়তানের কালো থাবার আঘাতে আজ ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। শির্ক এবং বিদআতের বেড়াজালে ভ্রান্ত মতবাদের উত্থানে আমরা আজ শত বিভক্ত। বিজাতীয় মতবাদের অনুপ্রবেশে আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতি মূলধারা হতে বিচ্যুত প্রায়। এ কারণে সহীহ্ দ্বীন এবং মানহাজের আলোকে মহান আল্লাহর মুখলিস বান্দা তৈরির কাজটি আজ আর হাল্কাভাবে নয়; বরং যুদ্ধের সেনাবাহিনীর মতো গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে। হিজবুশ শয়তানের বিরুদ্ধে হিজবুল্লাহর চেতনা নিয়ে সার্বক্ষণিক যুদ্ধে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে হবে।

সুপ্রিয় শুব্বান ভাইয়েরা! আপনারা জানেন, যুবকরাই সমাজ ও সভ্যতার মূল সেতুবন্ধন। মুসলিম সমাজকে মূল ধারায় দাঁড় করাতে হলে যুবকদেরকেই যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। হাশরের মাঠে আরশে আযীমের ছায়াতলে আশ্রয় পেতে হলে, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে সোনার বাংলায় পরিণত করতে হলে, সর্বোপরি আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হলে ছাত্র এবং যুবসমাজকে আল-কুরআন এবং সুন্নাহর আলোয় আলোকিত করতে হবে। কারণ এ যুবকরাই আগামীর নেতৃত্বে। এ দেশে সালাফী দাওয়াতের ভবিষ্যত দাঈ। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ভবিষ্যত কর্মী ও দায়িত্বশীল।

অতএব, আসুন! সংগ্রামী চেতনা নিয়ে সক্রিয় হই। নাস্তিক্যবাদ, বস্তুবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ইত্যাদি পার্থিব মতবাদের গোলক ধাঁধায় আজ যে যুবক পথ হারিয়েছে, বস্তুবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজের আসল ঠিকানা জান্নাতে ফিরে যাবার কথায় বিস্মৃত হয়েছে, শয়তানী শক্তির সৈন্যবাহিনীতে নাম লিখিয়েছে, মাদকাশক্তি আর উগ্রবাদে নিজেকে জড়িয়ে উদভ্রান্ত হয়েছে, চলুন তার কাছে যাই, তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করে তাকে দেশ-জাতি আর ইসলামের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে অনুপ্রাণিত করি। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন —আমীন। ❑

শুব্বানের সূচনায় বংশাল বড় মাসজিদ

আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর
তথ্য প্রযুক্তি ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সম্পাদক
বাংলাদেশ জমঈয়ত আহলে হাদীস।

বংশাল বড় মাসজিদ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

২৫০ বছর পুরনো পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী এই "বংশাল বড় মাসজিদ।" মাসজিদটি বংশাল-এর মেইন রাস্তার পাশে অবস্থিত। 'আড়াইশ' বছর আগে পুরান ঢাকাসহ অন্যান্য এলাকায় জমিদার ও নবাবদের অট্টালিকা ছাড়া বাড়িঘর ছিল খুবই কম; মাসজিদ ছিল না বললেই চলে। ফলে অনেক দূর-দূরান্ত থেকে অনেক মুসল্লি আসতেন এখানে সালাত আদায় করতে। তখন মাসজিদটি মুসল্লিদের সংখ্যার তুলনায় অনেক বড় ছিল। আহলে হাদীসদের কেন্দ্রীয় মাসজিদ হওয়ায় এটি বড় মাসজিদ হিসেবে পরিচিত হয়ে যায়।

মাসজিদের মূল ফটকে দাঁড়িয়ে আছে আদি আমলের মোটা শৈল্পিক দু'টি পিলার। পুরান ঢাকার বংশাল এলাকায় অবস্থিত বৃহত্তম মাসজিদ 'বংশাল বড় মাসজিদ'। মাসজিদের উত্তরে বংশাল রোড, পূর্বে হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, পশ্চিমে ফ্রেঞ্চ রোড ও দক্ষিণে বংশাল মহল্লা। এর মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীনতম বংশাল বড় মাসজিদ।

আনুমানিক ১৭৫৬ সালে বংশালের স্থানীয় বাসিন্দারা বংশাল বড় মাসজিদ নির্মাণ করেন। এক বিঘারও অধিক জমির উপরে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় বারান্দাসহ মাসজিদটি। মাসজিদটি আড়াইশত বছর আগের পুরানা মডেলের।

১৯৯৫ সালের দিকে তৎকালীন মুতাওয়াল্লী আলহাজ্জ মোহাম্মাদ হোসেনের নেতৃত্বে মাসজিদের বারান্দার উপর তিন তলা করা হয়। মূল বারান্দার পাশাপাশি আরো তিনটি বারান্দা বর্ধিত করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর, মাসজিদটির হাল ধরেন আলহাজ্জ মো. হোসেনের ছোট ভাই হাজী আওলাদ হোসেন। যিনি এখনো মাসজিদের দায়িত্ব পালন করছেন। এলাকাবাসীর সমন্বয়ে গঠিত হয় মাসজিদ পরিচালনা কমিটি।

মহিলাদের জন্য রয়েছে তিন তলাবিশিষ্ট আলাদা সলাত আদায়ের স্থান। তাদের আসা-যাওয়ার জন্য রয়েছে ভিন্ন পথ। শুরু থেকে এ মাসজিদে মহিলাদের সলাতের ব্যবস্থা রয়েছে, যা ঢাকা শহরে প্রথম। ফলে বহু বছর ধরে মহিলারা সলাত পড়ছেন এখানে। যা আজও বিদ্যমান।

পুরনো ঐতিহ্যবাহী এ মাসজিদে প্রতিদিন সলাত পড়তে আসেন শত শত নারী-পুরুষ। জুমু'আর সলাতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এই বড় মাসজিদ।

মাসজিদের দক্ষিণ পাশে সীমানার ভিতরে রয়েছে একটি ফোরকানিয়া হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা। স্থানীয় অনেক ছেলেই এ মাদ্‌রাসা থেকে হাফিয হয়েছেন এবং এ মাসজিদেই তারাবীহ পড়িয়েছেন। এই হাফিযদের তৈরিতে ওস্তাদ হাফিয হাসানের অবদান উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও মাসজিদে রয়েছে আহলে হাদীসের কনফারেন্স কক্ষ, যেখানে ইফতার মাহফিলসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বংশাল বড় মাসজিদের নেতৃত্বে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার আহলে হাদীস মাসজিদগুলোর সহযোগিতায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। যা আহলে হাদীসদের ঈদের প্রধান জামা'আত বা ঈদগাহ হিসেবে পরিচিত। এই ঈদের জামা'আত ১৪০ বছরের অধিক সময় ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। তখন এটি তিন কোনাচা মাঠ নামে পরিচিত ছিল।
এছাড়া তৎকালীন আজাদ পত্রিকার সম্পাদক মওলানা আকরাম খাঁ, মাওলানা কবির উদ্দিন, মাওলানা বেলায়েত হোসেন, মাওলানা মুনতাসির আহমাদ রহমানী, মাওলানা আতাউর রহমান খান বা আতা খান, মাওলানা ফজলুর রহমান, মাওলানা আবূ তাহের বর্ধমানীসহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এ মাসজিদের ইমাম ও খতীব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানী ঢাকায় এলে জুমু'আর সলাত আদায় করতেন ঐতিহ্যবাহী এ মাসজিদে।

দাওয়াতী কাজ প্রসারে বংশাল বড় মসজিদঃ
কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ প্রসারে বংশাল বড় মসজিদ সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ মাসজিদ ব্যক্তি ও সমাজে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং শিরক-বিদআত ও কুসংস্কার মুক্ত সমাজ বিনির্মাণে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জুম'আর দিন ছাড়াও এ মাসজিদে পাক্ষিক, মাসিকভাবে সান্ধ্যকালীন কুরআন ও হাদীসের দারস আয়োজনের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করা হয়। এমনকি এ মাসজিদে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক ধর্মীয় আলোচনা আয়েজনের মধ্য দিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে ঈমান ও আমলে সচেতন করা হয়। আর এ আলোচনাগুলোতে আমন্ত্রণ জানানো হয় দেশী কিংবা বিদেশী আহলে হাদীসের বিজ্ঞ ইসলামিক চিন্তাবিদ ও আলেম-উলামাদের। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ইসলামিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমেও তরুণ ও যুবসমাজকে বিশুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধকরণে অবদান রাখে।

বংশাল বড় মসজিদে শুব্বানের সূচনাঃ
এই ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ মাসজিদে ১৯৮৯ সালের ২৮ ডিসেম্বরে ঐতিহ্যবাহী সংগঠন 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসে'র অঙ্গ-যুবসংগঠন হিসেবে 'জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ' গঠিত হয়। এ মাসজিদ হতেই তাওহীদভিত্তিক কাফেলা শুব্বানের পথযাত্রার সূচনা। ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়ক মনোনীত হন যশোরের মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। এ ঐতিহাসিক মুহুর্তে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ সেসময়ের জমঈয়ত সভাপতি আল্লামা ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী, অধ্যাপক হাসানুজ্জামান, প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামছুর রহমান (রহিমাহুল্লাহ)-সহ দেশী-বিদেশী আমন্ত্রিত মেহমানবৃন্দ। এর পর শুব্বানের আরো কয়েকটি কেন্দ্রীয় কাউন্সিল (নির্বাচন প্রক্রিয়া) ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর কাছে দুআ করি শুব্বানের সেই সূচনা ও অগ্রযাত্রা কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হোক, তাদের দ্বীনী খেদমত আল্লাহ্ কবুল করুন। এছাড়াও এ মাসজিদের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যারা সেবায় জড়িত ছিলেন এবং আছেন, আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন –আমীন।

বংশাল বড় মসজিদ থেকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন: প্রাপ্তি, প্রত্যাশা ও চ্যালেঞ্জ
বংশাল থেকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনিস্টিটিউশন: শুব্বানের গতি-প্রকৃতি
৩৪ বছরে শুব্বান: প্রত্যাশা, প্রাপ্তি ও চ্যালেঞ্জ
৩৪ বছরে শুব্বানের গতি-প্রকৃতি: প্রত্যাশা, প্রাপ্তি ও চ্যালেঞ্জ

ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ

আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ।

আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধন মানব জীবনকে সহজতর ও আরামদায়ক করলেও মানুষের মানবীয় বোধ ও গুণাবলি কমতে শুরু করেছে চরমভাবে। দয়াময় আল্লাহর সাথে মানবের স্বর্গীয় মধুময় সম্পর্কের উপর বিভিন্ন আঙ্গিকে, বহুমাত্রিকভাবে জাহিলিয়াতের শিরকি আস্তরের প্রলেপ পড়েছে। একমাত্র রাসূল সা.-এর প্রদর্শিত তরীকা ছেড়ে ধর্মীয় বিধি-বিধান পরিপালনে রাসূলের পদ্ধতির আবশ্যকতায় শৈথিল্য প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষ জন্ম দিচ্ছে নতুন নতুন পদ্ধতি ও ইবাদতের সিস্টেম; যা সুস্পষ্টভাবে বিদ'আত হিসেবে ঘোষিত ও সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। পাশাপাশি বিশ্বায়নের এ যুগে প্রযুক্তি ঘেরা আধুনিক এ সময়ে প্রতিনিয়ত মানুষ ইসলামের মৌলিক আক্বীদাহ্ ও বিশ্বাস থেকে ধীরে ধীরে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। বস্তুবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব এলডিসিভুক্ত রাষ্ট্রসমূহে ঋণ ও নানাবিধ আর্থিক ও পরামর্শ সুবিধা-সহায়তার চাদরে বেষ্টন করে দুর্বলদের অনেকটা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে পুরো ইসলামী জগত। ফলে বনি আদম একমাত্র স্রষ্টার আরাধনা-আনুগত্য ছেড়ে সৃষ্টির গোলামী ও দাসত্ব শুরু করেছে। অথচ ইসলামের মৌলিক দর্শনই হলো তাওহীদ। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে নিয়ে, আল্লাহ্ তা'আলাকে ঘিরে এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মানব তার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে। নবী-রাসূলগণের আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল মানবতাকে তাওহীদে বিশ্বাসী করা, মানুষকে মহান আল্লাহর দাসত্বের শৃঙ্খলে নিয়ে আসা, তাঁর দেওয়া বাণী বা প্রত্যাদেশ দিয়ে মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করা এবং শিরকি তৎপরতা থেকে পূত-পবিত্র রাখা। ইসলামী শরীয়াতের বিধানাবলি পালনে একমাত্র সর্বশেষ রাসূলের তরীকাকে আন্তরিকভাবে মেনে নেওয়া। এ চেতনায় গড়ে উঠেছে 'আহলে হাদীস'। 'ফিরকায়ে নাজিয়া' তথা মুক্তিপ্রাপ্ত দল হিসেবে ইসলামের স্বর্ণযুগ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে এই দলটি উক্ত মহান ব্রত পালন ও প্রচার করে আসছে।

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও কঠোর সতর্কবাণী সত্ত্বেও মুসলমানগণ যুগে যুগে দেশে দেশে কুরআন ও হাদীসের মর্মকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নানা দল ও উপদলে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। আহলে হাদীসগণ সেই বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত মুসলমানদের কুরআন ও সুন্নাহর মর্মকেন্দ্রে সম্মিলিত করার বিরামহীন চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন। আহলে হাদীস কারা? যারা কুরআন ও হাদীসকে সরাসরি অনুসরণ করে তারাই আহলে হাদীস। এটি বিশেষ কোনো মাযহাব বা ফিরকার নাম নয়। সাহাবায়ে কেরাম,

তাবেয়ীন, তাবি তাবিয়ীন ও চার মাযহাবের ইমামগণ আহলে হাদীস পথ ও মতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব সৃষ্টির আগে তথা ইসলামের স্বর্ণ যুগে চার মাযহাব ছিল না। তখনকার মুসলমানগণ কুরআন ও হাদীসের উপর কায়েম ছিলেন বলে তারা 'আহলে হাদীস' নামে পরিচিত ছিলেন।

এ উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাবের যুগ থেকেই এই দলের অস্তিত্ব ছিল। ১৯০৬ সালে অল ইন্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্স এবং ১৯১৪ সালের কলকাতায় 'আঞ্জুমানে আহলে হাদীস, বাঙ্গালা' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ১৯৪৬ সালের রংপুরের হারাগাছ বন্দরের ঐতিহাসিক কনফরেন্সে গঠিত হয় 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস।'[১] দেশ স্বাধীনের পর 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস' নামকরণ করা হয়। প্রথম প্রতিষ্ঠিত কলকাতার ১ নং মার্কুইস লেনের মিশরীগঞ্জের জমঈয়তের দফতর ১৯৪৮ সালে পাবনা স্থানান্তরিত হয়ে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বরের পর ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা হয়ে বর্তমানে ৭৯/ক/৩ উত্তর যাত্রাবাড়ীতে হাজারো স্মৃতিধারণ করে ঐতিহাসিক কালের স্বাক্ষ্য হয়ে মহিরুহ আকারে দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে জমঈয়তের মুখপাত্ররূপে 'মাসিক তর্জুমানুল হাদীস'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং ১৯৫৭ সালের ৭ অক্টোবর মুসলিম সংহতির দীপ্ত নকীব রূপে 'সাপ্তাহিক আরাফাত'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। আজো এ দু'টি পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

উপমহাদেশের প্রাচীনতম তৌহিদবাদী সংগঠন 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর তরুণ, ছাত্র ও যুবকদের একমাত্র সংগঠন 'জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ'। ১৯৮৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর **রাজধানী পুরান ঢাকার বংশাল মসজিদে** গঠিত হয় 'জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ'। ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটির প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়ক মনোনীত হন যশোরের মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। পরে ১৯৯৪ সালে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন আহ্বায়ক করা হয় রাজশাহীর মোঃ গালাম কিবরিয়া নূরীকে। কিন্তু বাস্তবে শুব্বানের দায়িত্বশীলবৃন্দ দেশে যুবসমাজের মাঝে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক তেমন কোনো আবেদন তখন বিভিন্ন কারণে রাখতে পারেননি।[২] এর কিছু সময় পর ১৯৯৭ সালের দিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে অধ্যয়নরত ছাত্র মোহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তৎকালীন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সুযোগ্য সভাপতি দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল বারীর সম্মতিতে ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করার অনুমতি পান। তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আলকুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহকে সাথে নিয়ে নতুন করে শুব্বানকে সাজানোর সিদ্ধান্ত নেন। গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতিসহ ব্যক্তিগত রিপোর্ট ফরম, সাংগঠনিক কাগজপত্রাদি ও আনুষঙ্গিক অফিসিয়াল ব্যবস্থাপনা নতুন করে তৈরী করেন। এ সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম ও প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান ও প্রফেসর হাসানুজ্জামান প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন। গঠিত হয় শুব্বানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

---

[১] বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস: পরিচিতি ও ইতিহাস, ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কনফারেন্স- ১৯৯২, স্মরণিকা, পৃ. ৪৫।

[২] অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গযনফর, *জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ: অতীত ও বর্তমান*, কেন্দ্রীয় সম্মেলন- ২০০৪, স্মরণিকা, পৃ. ৩৮।

শাখা। এ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ছাত্র ইফতিখারুল আলম মাসউদ ও মো: মতিউর রহমান। ১৯৯৯ সালে জমঈয়তের ৭ম কনফারেন্সে উল্লিখিত যুবকদের প্রচেষ্টায় শুব্বানের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের জন্য পৃথক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[৩] সভাপতি নির্বাচিত হন মোহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, সেক্রেটারী মোহাম্মদ ইজাজুল হক ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ। শুব্বান বিভাগের পরিচালক মনোনীত হন অধ্যাপক ওবায়দুল্লহ গযনফর। এ কমিটি সারা দেশে সফর করে অভুতপূর্ব সাড়া জাগায় যুব সমাজের মাঝে।[৪] দেশব্যাপী ছড়িয়ে যায় শুব্বানের দাওয়াত। ২০০২ সালের ৮ জানুয়ারি রাজধানী ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবে প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আসাদুল ইসলাম-এজাজুল হক কমিটি সফলতার সাথে দুই বছরের মেয়াদ শেষ করে। পরবর্তী প্রত্যেক দুই বছর পর পর কেন্দ্রীয় সম্মেলনের মাধ্যমে সভাপতি ও সেক্রেটারী পরিবর্তনের ধারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে আজও অব্যাহত আছে। সেই ধারাবাহিকতায় আজ ২৯ জুলাই, ২০২৩ **ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে** আয়োজিত হচ্ছে শুব্বানের ১০ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন। আর এর মাধ্যমে শুব্বানের উপর দিয়ে অতিক্রম করছে ৩৪ বছর।

সমাজ ও দেশ থেকে সর্বপ্রকার শিরক-বিদআত দূরীকরণ, অনৈতিকতা ও অপসংস্কৃতির অপসারণসহ সকল অনৈসলামিক কাজ থেকে বিরত রাখতে ও দেশের মানুষকে ইসলামের সর্বজনীন ও সুমহান আদর্শের দিকে আহ্বান জানানোই বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কাজ। জমঈয়তের কাজকে গতিশীল করতে, জমঈয়তের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরী করতে, ছাত্র, যুবক ও তরুণদের দ্বীনি চেতনায় একীভুত করতে, অপসংস্কৃতির সয়লাব থেকে মুসলিম তরুণদের ইসলামের সঠিক চেতনায় ফিরিয়ে আনতে সারা বাংলাদেশে কাজ করছে শুব্বানের একঝাঁক মেধাবী যুবকাফেলা। সালাফী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত গড়ে উঠেছে শুব্বানের শত শত শাখা-উপশাখা। গত ৩৪ বছরে গড়ে ওঠা অসংখ্য শুব্বানের নেতাকর্মী ব্যক্তিগত কর্মের সাথে সাথে জমঈয়তের কেন্দ্রীয় ও জেলাসহ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিসিএস ক্যাডার, ব্যাংকার ও এনটিআরসি-এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে শুব্বানের যুবকরা তাদের চমৎকার ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছে। কেন্দ্রীয়ভাবে গড়ে উঠেছে শুব্বানের গবেষণা বিভাগ। প্রকাশ পেয়েছে এ গবেষণা বিভাগ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই। অধিকন্তু, শুব্বানের শত শত কর্মী দেশের বাইরে মদীনাসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দ্বীনি খেদমাত করছে। ওয়াজ, হালাকা, লেখালেখি ও জুমআর খুৎবার মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ সম্প্রসারণে অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে। গত বছরগুলোতে দেশের বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং জেলা শাখার নিজেদের উদ্যোগে দাওয়াতী কাজে 'খুৎবার দাওয়াতী টিম' ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ে চোখে পড়ার মতো।

শুব্বানের এ দীর্ঘ চলার পথে অনেক অর্জন থাকলেও প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির যোজন যোজন পার্থক্য এখনো বিদ্যমান রয়েছে। বিশেষ করে দায়িত্বশীলদের ব্যক্তিগত সমস্যা, সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে দক্ষতার অভাব, নেতৃত্বদানে যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা ও ক্যারিয়ার গঠনজনিত সমস্যা অন্যতম। ব্যক্তি কেন্দ্রিক

[৩]তদেব।
[৪]তদেব।

সমস্যায় রয়েছে- কাঙ্খিত মানের সংগঠন পরিচালনার জন্য দক্ষতার অভাব। জ্ঞানে, বিচক্ষণতায়, তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রয়োজনীয় দক্ষতার ঘাটতি। শুব্বান জনশক্তি নিজেদের জীবনের ব্যক্তিগত পরিকল্পনা তৈরীতে অবহেলা ও অসচেতনতা, অর্থনৈতিক সমস্যা ও ক্যারিয়ার গঠনে অবহেলা অন্যতম। দ্বীনী দায়িত্ব পালন 'ফরয' ইবাদত; এর জন্য সাওয়াব পাওয়া যাবে মর্মে সিরিয়াসনেসের অভাব এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করলে- এর জন্য পরকালে জবাবদিহি করতে হবে মর্মে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শিত হয়।

এ জন্য শুব্বানের সকল স্তরের দায়িত্বশীলদের নিজেদের ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক দুই ধরনের কর্মপরিকল্পনা থাকতে হবে। বাৎসরিক, ষান্মাসিক ও মাসিক রুটিনে সেই পরিকল্পনার কাজ ভাগ করে সাজিয়ে নিতে হবে। দৈনন্দিন রুটিনও সেই আলোকে ডিজাইন করা থাকবে। সাংগঠনিক পরিকল্পনায় থাকবে নিজের সাংগঠনিক মানোন্নয়ন ছক, কুরআন ও হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞানগত দক্ষতা অর্জনের ছক, বিভিন্ন বিখ্যাত বই অধ্যয়ন ও সাংগঠনিক সিলেবাসের বই সমাপ্তকরণের টার্গেট। আরেকটা পরিকল্পনা থাকবে একান্তভাবে নিজের ব্যক্তিগত ক্যারিয়ার গঠনের। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার আলোকে নিজেকে ৫ বছর, ১০ বছর এবং ১৫ বছর পর কোথায় দাঁড় করানোর ইচ্ছা সে অনুযায়ী এ পরিকল্পনা সাজাতে হবে। ধীরে ধীরে নিজের সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত উন্নয়নে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নিয়মিত নিরলস পরিশ্রম করে যেতে হবে। দিন শেষে কী কাজ হলো, আর কী হলো না– এ আত্মসমালোচনা নিয়মিত করে নিজের দক্ষতা ও জ্ঞানগত দিক দিয়ে নিজেকেই এগিয়ে নিতে হবে। তথ্য-প্রযুক্তিসহ ব্যবহারিক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। যেমন- ড্রাইভিং শেখা, ইংরেজী ও আরবিসহ বিভিন্ন ভাষাগত দক্ষতা ও তথ্য-প্রযুক্তিসংক্রান্ত বিভিন্ন জ্ঞান যথা- গ্রাফিক্স ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, আউটসোর্সিং প্রভৃতি। এসকল বিশেষ স্কিলে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দিয়ে ট্রেনিং বা ওয়ার্কশপ করা যেতে পারে।

সাংগঠনিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে- নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক কার্যক্রম বছরব্যাপী সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক সবসময় না চলা। নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা না থাকা। সাংগঠনিক জবাবদিহিতার কাঠামো শক্তভাবে গড়ে না ওঠা। অর্থনৈতিক সাপোর্ট সীমিত ও কম থাকা। সাংগঠনিক মিশন ও ভিশন সুস্পষ্ট না থাকা।

সাদামাটাভাবে বার্ষিক পরিকল্পনা না করে সময়, সুযোগ, লোকবল ও আর্থিক সুবিধার আলোকে (আকার ও পরিধি প্রয়োজনে ছোট হউক) কার্যকর সাংগঠনিক বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা ষান্মাসিক, ত্রৈমাসিক ও মাসিক পরিকল্পনায় ঢেলে সাজাতে হবে। কেন্দ্রীয় এ পরিকল্পনার আলোকে জোন, জেলা, উপজেলা, বড় বড় মাদরাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তাদের নিজস্ব সুযোগ-সুবিধা ও সক্ষমতার আলোকে এভাবে বিভিন্ন স্তরে সাংগঠনিক পরিকল্পনা তৈরী করবে। সংগঠনের সকল স্তরে মাসের প্রথমে বিগত মাসের কাজের পর্যালোচনা ও দুর্বলতা নির্ণয়, কারণ ও প্রতিকার পদ্ধতিসহ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতি মনযোগী হতে হবে। অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে নতুন মাসের কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা আবার ঠিক করবে। এভাবে নিখুঁতভাবে গভীর মনযোগ সহকারে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হলে সংগঠনের গতি বৃদ্ধি

পাবে। শাখা-উপশাখাসহ সংগঠনের সকল লেভেলে ও বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্ব তৈরী হবে। সংগঠনের সকল পর্যায়ে জবাবদিহিতার অনুশীলন গড়ে উঠবে। দায়িত্বশীলদের নিজেদের বক্তিগত পরিকল্পনাও থাকতে হবে। নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত বার্ষিক পরিকল্পনা থাকবে দুই ধরনের। এক. সাংগঠনিক মান বৃদ্ধি করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও টার্গেট নির্ধারণ। দুই. নিজের ভবিষ্যৎ সুন্দর ক্যারিয়ার গড়ার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি নিজের ব্যক্তিগত তাড়নায় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য পড়াশুনা ও আনুষঙ্গিক কাজও সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত পড়াশোনার মাঝে দায়িত্বশীলদের ভারসাম্য রক্ষা করা খুবই আবশ্যক। এ ভারসাম্যের স্নিগ্ধতায় প্লাবিত হবে ও প্রভাব পড়বে অধঃস্তন সংগঠন তথা– আরেফ, সালেক ও সালেহগণের ওপর। বার্ষিক, মাসিক ও দৈনন্দিন কর্ম সম্পাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সবচেয়ে বেশী দরকার অর্থনৈতিক শক্তি। এ ক্ষেত্রে জমঈয়তকে আরো একধাপ এগিয়ে আসতে হবে। শুব্বানের বিভিন্ন স্তরে সুধী-শুভাকাঙ্ক্ষী বানাতে হবে, নতুন করে বিশেষ ব্যক্তিদের টার্গেট করে শুভাকাঙ্ক্ষী বাড়াতে হবে। মাসিক ও এককালীন ডোনেশন নিয়ে অর্থনৈতিক যোগান শক্তিশালী করতে হবে। জমঈয়তকেও তাদের বার্ষিক মিশন-ভিশন ঠিক করতে হবে। যার আলোকে শুব্বান তাদের পরিকল্পনা সাজাতে পারে। সাংগঠনিক বার্ষিক লক্ষ্য নির্ধারণসংক্রান্ত অস্পষ্টতা দিয়ে এবং গডডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে চলার স্টাইল পরিহার করতে হবে। প্রত্যেকটি দলেরই একটি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও মিশন-ভিশন থাকে। তা যত আধুনিক ও বাস্তবসম্মত হবে; সংগঠনে তত নতুন নতুন কর্মীবাহিনী তীব্র স্রোতের মতো সংগঠনের ছায়াতলে ভিড়বে। তখন সাংগঠনিক ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন সকলের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির যোজন যোজন দূরত্ব কমবে।

জমঈয়ত সবসময় শুব্বানের অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক সাপোর্টে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে তা চাহিদা ও প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রতুল। এ ক্ষেত্রে শুব্বান বিভাগের পরিচালককে আরো বেশি তৎপর হতে হবে। জমঈয়ত-নেতৃত্ব শুব্বানের জাগরণ ও বিকাশ অবশ্যই চান; তারপরও কিছু কিছু জেলায় সম্পর্ক আরো মধুর হওয়া প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট শাখা ও স্থানের সম্পর্কের ক্ষতগুলো চিহ্নিত করে জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে। জমঈয়তের তত্ত্বাবধানে শুব্বানের যুবকদের চাকুরী ও স্টাবলিশমেন্ট ম্যানেজমেন্ট না থাকা একটি সমস্যা। শুব্বান বিভাগের পরিচালককে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা জমঈয়তের নেতৃবৃন্দের কাছে পেশ করতে হবে। সবচেয়ে সুখবর হলো, আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে জমঈয়ত এখন অনেক গোছালো, সুসংগঠিত এবং নেতৃত্বও অনেক বিজ্ঞ ও আন্তরিক। সুতরাং প্রয়োজন শুধু উদ্যোগ গ্রহণের। যোগ্য ও মেধাবীদের মূল্যায়নসহ সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন শেষে কর্মজীবনে প্রবেশে সহযোগিতা প্রদর্শনে আন্তরিকতার ঘাটতি শুব্বানের নেতৃত্ব তৈরীতে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে অনেকেই মনে করেন। এ ক্ষেত্রে শুব্বানকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। নিজেদের দক্ষতা ও কর্মমুখী শিক্ষার পাশাপাশি উন্নত ক্যারিয়ার গঠনের জন্য সাংগঠনিকভাবে বিভিন্ন কোর্স চালু করতে হবে। সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত বিভিন্ন চাকুরিতে প্রবেশের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ফেরত বিশাল একটি মেধাবী শ্রেণি আছে; যাদের ফাজিল/কামিল রয়েছে তাদের বিভিন্ন শর্ট কোর্সের মাধ্যমে এনটিআরসিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে শুব্বানকেই বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। গত দুই বছরে সরকার

এনটিআরসিএর মাধ্যমে বিভিন্ন মাদরাসা, কলেজ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক লক্ষাধিক যুবকের চাকুরির ব্যবস্থা করেছে। এজন্য সবার আগে সকল কর্মীকে কমপক্ষে ফাজিল/কামিল পর্যন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে উৎসাহিত করতে হবে। শুধু তাই নয় কামিল থাকলে বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণও করা যাচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক এই পরীক্ষাগুলোতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য একটু মনযোগ সহকারে পরিকল্পিতভাবে নির্ধারিত সিলেবাস দেখে পড়লেই হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য দরকার সঠিক গাইডেন্স ও প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের। অনেক সময় যুবকদের পরিশ্রমের ইচ্ছা থাকলেও সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকার পরেও সোনার হরিণ অধরাই থেকে যায়। এই জন্যই ইংরেজিতে একটি কথা আছে- *An idea can change everything.*

শুব্বানকে কর্মীদের সঠিক দিকনির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় পরিচর্যার মাধ্যমে উপযুক্তভাবে কর্মীদের চাকুরী উপযোগী করে গড়ে তোলার এই দিকটি যত্নসহকারে আঞ্জাম দিতে হবে। তাহলে দেশের সর্বত্র সবখানে সকল সেক্টরে বিশুদ্ধ আক্বীদার লোকজন পৌঁছে যাওয়া সহজ হবে। বেকারত্ব ঘুছবে, শুব্বানেরও কর্মস্থান হবে। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, চাকুরীর সব সেক্টরে শুব্বান কর্মীকে পেতে হলে আমাদের পরিচালিত আলিয়া মাদরাসাগুলোর আলিম পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিশেষ যত্ন নিয়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে যোগ্য করে তুলতে হবে। দেখা যাবে বিশ্ববিদ্যলয় পড়া শেষে তারা সরকারি-বেসরকারি ভাল জব সেক্টরে প্রবেশ করবে আবার তাদের মাধ্যমে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে শুব্বান শাখা খোলাও সহজ হবে। এমন পদ্ধতিতে না আগালে আমরা আর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী রহ. কিংবা ডিআইজি রুহুল আমীনের মত ক্যারিয়ারের অধিকারী কাউকে পাব না।

আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল বাকী (রহ.), আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কোরায়শী (রহ.), আল্লামা নাযির হোসাইন (রহ.), নওয়াব সিদ্দিক হাসান ভূপালী (রহ.), মাওলানা আকরাম খাঁ (রহ.), মাওলানা আলীমুদ্দীন নাদিয়াভী (রহ.) ও আল্লামা প্রফেসর ড. এম এ বারী (রহ.) সহ বহুসংখ্যক তাওহীদপন্থী আলিম বহুমাত্রিকভাবে উপমহাদেশের ঘরে ঘরে তাওহীদের অমীয় বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। শিক্ষায়, সমকালীন জ্ঞানে, যোগ্যতা ও দক্ষতায় এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়ে অনেকেই রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পেয়েছেন। জমঈয়তের সাবেক নেতৃত্বের যোগ্যতার পরিধি এতো ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিলো যে, সাংবাদিকতায় তারা অগ্রপথিক, সমকালীন লেখালেখিতে শ্রেষ্ঠ অবস্থান, রাষ্ট্রীয় শিক্ষাকমিশনে নেতৃত্ব প্রদান ও বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ সর্বত্র যোগ্যতা ও দক্ষতায় শীর্ষস্থানে অবস্থান করেছিলেন। শুব্বানের যুবকদের এ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। শুব্বানের সকল কর্মী কমপক্ষে জ্ঞানে, দক্ষতায়, বিচক্ষণতা ও চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে স্থান করে নিতে হবে। এ জন্য নতুন ও আগামীর নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান থাকবে, সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠন কায়েম করুন। মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়াকে স্পেশালি নেতৃত্ব তৈরীর কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

যুগে যুগে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের আত্মত্যাগ

-ড. এ এস এম আজিজুল্লাহ

এই পৃথিবীতে অগণিত সৃষ্টিকূলের মধ্যে মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম সৃষ্টি। আল্লাহ্ বলেন:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ.

অর্থাৎ 'আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছি'।[১]

মানুষের বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা আছে; যে কারণে মানুষ সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠসৃষ্টি। যেহেতু মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, সেহেতু দুনিয়াবী যিন্দেগীতে তাদের দায়-দায়িত্বও বেশী। মানুষের দুনিয়াবী জীবনকে সাধারণত শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য এই তিনটি স্তরে মূল্যায়ন করা হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

اللهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً

অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাদেরকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর দুর্বলতার পরে শক্তিদান করেন, অতঃপর শক্তির পরে দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য'।[২] অত্র আয়াতে মানব জীবনের উক্ত তিন অবস্থার সুস্পষ্ট উল্লেখ বিদ্যমান। শৈশবে মানব দেহে গতি থাকে, কিন্তু পরিপক্ক ও পরিমিত জ্ঞান থাকে না; আবার বার্ধক্যে মানুষের নানাবিধ জ্ঞানের সমাহার ঘটলেও তখন গতি থাকে না। কিন্তু যৌবন এমন একটি মূল্যবান সময় যখন দেহে গতিও থাকে অভিজ্ঞতালব্ধ পরিপক্ক জ্ঞানও থাকে। তাই যেকোনো বিবেচনায় যৌবন কালই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তারুণ্যের গতি সাধারণ গতি নয়, তারুণ্যের গতি ঝড়-ঝঞ্ঝার মতো অদম্য, যেদিক দিয়ে বয়ে যায় সেদিকের ঘরবাড়ি, গাছপালা, প্রকৃতি সকলকে জানান দিয়ে যায়। তারুণ্যের গতি সমাজ পরিবর্তনের গতি। সমাজের সকল অন্যায়, অনাচার ও অসত্যকে উৎখাত করে তদস্থলে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত কালই হল যৌবনকাল। যৌবনকালে মানব জীবনে ভাল-মন্দ দু'টোরই সমাবেশ ঘটে। যৌবনকালে মানুষের চিন্তাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, মেধা ও মননশক্তি, কর্মশক্তি ইত্যাদি শক্তিসমূহ পরিপক্ক হওয়ার উপযুক্ত সময়। যৌবনের এই অদম্য শক্তির কথা অকপটে স্বীকার করে যুগে যুগে সকলেই যৌবনের জয়গান গেয়েছেন।

সৌন্দর্যের কাল যৌবন, শক্তির কাল যৌবন, জীবনের পূর্ণতার কাল যৌবন। কবি বলেছেন 'এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় তার'। যৌবন যেমন সৃষ্টির স্বরূপ, পূর্ণতার স্বরূপ, তেমনি পরিপূর্ণ জীবন ও প্রাণের স্বরূপ। জীবন ও সমাজ পরিবর্তনে এবং তার সৌন্দর্য বর্ধনে তারুণ্য শ্রেষ্ঠ নিয়ামক। তাইতো দেখতে পাই প্রসিদ্ধ কবি-সাহিত্যিকদের লেখনির একটা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে এই যৌবনের স্তবগান। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা.)ও তারুণ্যের উৎসাহ উদ্দীপনার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিবেশে তাদেরকে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাগত জানিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে জানাতে উৎসাহিত করেছেন। যুবসমাজ যাতে বিপথগামী না হয়ে পড়ে, সেজন্য তাদের সঠিক জ্ঞান দানে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে প্রকাশ, 'তিনি কোনো মুসলিম যুবককে দেখলে খুশী হয়ে বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর

---

* সাংগঠনিক সেক্রেটারী, রাজশাহী পশ্চিম জেলা জময়ঈতে আহলে হাদীস ও সহকারী অধ্যাপক, আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজ, মোহনপুর, রাজশাহী।

১. সূরা ত্বীন, আয়াত নং ৪।

২. সূরা রুম, আয়াত নং ৫৪।

অসিয়ত অনুযায়ী তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। রাসূল (সা.) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার এবং তোমাদেরকে হাদীস বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা, তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী আহলে হাদীস।'[৩]

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও তারুণ্যের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, অনুরাগ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কবিকে দেওয়া এক সংবর্ধনার জবাবে তরুণ ও যুবসমাজের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অভিভাষণে যৌবনের ধর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিজেকে গানের পাখির সঙ্গে তুলনা করে কবি বলেন, 'বনের পাখির মত স্বভাব আমার গান করা। কাহারও ভাল লাগিলেও গাই, ভাল না লাগিলেও গাহিয়া যাই। বায়স-ফিঙে যখন বেচারা গানের পাখিকে তাড়া করে, তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে, তখন সে এক গাছ হইতে উড়িয়া আরেক গাছে গিয়া গান ধরে। তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান। সে গান করে আপনার মনের আনন্দে। যদি তাহাতে কাহারও অলস-তন্দ্রা মোহ-নিদ্রা টুটিয়া যায়, তাহা একান্ত দৈব। ... আমি যে গান গাই, তাহা যৌবনের গান। তারুণ্যের ভরা-ভাদরে যদি আমার গান জোয়ার আনিয়া থাকে, তাহা আমার অগোচরে। ... আমার একমাত্র সম্বল আপনাদের তরুণদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালবাসা, প্রাণের টান। তারুণ্যকে যৌবনকে আমি যেদিন হইতে গান গাইতে শিখিয়াছি, সেই দিন হইতে বারে বারে সালাম করিয়াছি, তাজিম করিয়াছি'।

তারুণ্য বা বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। কারণ তরুণ ও তারুণ্য এক জিনিষ নয়; তরুণ বয়সের একটি স্তর মাত্র, যা সকলের জীবনে আসে। কিন্তু তারুণ্য একটা গতিশীল জীবনের গতিময় অবস্থা, যা সকলের ভাগ্যে জোটে না। তাই তো কবি নজরুল আরো বলেছেন, 'বহু যুবককে দেখিয়াছি–যাহাদের যৌবনের উর্দির নীচে বার্ধক্যের কঙ্কাল-মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি–যাঁহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘ-লুপ্ত সূর্যের মত প্রদীপ্ত যৌবন'। এজন্য যারা 'পুরাতনকে মিথ্যাকে মৃতকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থকে', 'মায়াচ্ছন্ন নব-যাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচ-কাওয়াজ করিতে জানে না', যারা 'অটল-সংস্কার-পাষাণ স্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে', যারা 'নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে, আলোকপিয়াসী প্রাণ-চঞ্চল শিশুদের কল-কোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত' করে; বয়স তার যাই হোক না কেন, সে কখনো তরুণ নয়। তরুণ তারাই 'যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ় মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড প্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অতল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে'। নজরুলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আরেক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক যৌবনকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। দেহের যৌবন, আর মনের যৌবন। তিনি বলেন, 'একের দেহের যৌবন অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার জো নেই; কিন্তু একের মনের যৌবন লক্ষ লোকের মনে সংক্রমণ করে দেওয়া যেতে পারে। দেহের যৌবন একবার হারিয়ে গেলে তা আর ফিরে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তা ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু মনের যৌবন চিরস্থায়ী। এমনিভাবে যুগে যুগে সকলেই যৌবনশক্তির তাজিম করে এসেছে।

তরুণ বা যুবসমাজই দেশ ও জাতির ভবিষ্যত। আজ যে শিশু, কাল সে যুবক, পরশু সে জাতির কর্ণধার। যুগে যুগে এই তরুণরাই পৃথিবীর বুকে বহু অসাধ্য সাধন করেছে। আমাদের দেশের '৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম, '৯০-এর গণআন্দোলনে এই যুবকরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিভিন্ন নবী-রাসূলের যুগে দ্বীনের প্রচার-প্রসারে যুবসমাজ যে অবদান রেখে গেছেন তা অনস্বীকার্য। ইসলামের আদি যুগ থেকে শত বাঁধা-বিপত্তি, জেল-জুলুম, অত্যাচার-

৩. সিলসিলা সহীহা, হাদীস নং ২৮০; বায়হাকী, হাদীস নং ১৭৪১।

নির্যাতনকে উপেক্ষা করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উদগ্র বাসনা হৃদয়ে ধারণ করে, অনেক ক্ষেত্রে জীবন বাজি রেখে এই যুবসমাজই বুকের তপ্ত রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। কিয়ামত পর্যন্ত যুবসমাজের এরূপ জীবন উৎসর্গের এই ধারা অব্যাহত থাকবে ইন-শা-আল্লাহ্। নিম্নে দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যুগে যুগে যুবসমাজের কিছু আত্মত্যাগের ঘটনার অবতারণা করা হল-

পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রত্যেক নবী-রাসূলের যুগে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। শুরুতেই আলোকপাত করতে চাই এমন একটি ঘটনা, যার মধ্যে যুবসমাজের প্রেরণার উৎস লুকায়িত আছে। বনী ইসরাঈলের এক যুবক তার চাচাতো বোনকে বিয়ে করা এবং চাচার অঢেল সম্পত্তি কুক্ষিগত করার মানসে রাতের অন্ধকারে চাচাকে হত্যা করে অন্যের বাড়ির সামনে মৃতদেহ রেখে সকালে উঠে চক্রান্ত করে চাচা হত্যার দায় তাদের উপর চাপিয়ে দেয়। বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়; এমন কি উভয় গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের উপক্রম হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, 'আর যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করে একে অপরকে অভিযুক্ত করছিলে। যা তোমরা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিলেন'।[৪] আল্লাহ্ কীভাবে প্রকাশ করে দিলেন? এক পর্যায় বিবদমান দু'টি পক্ষই বিষয়টি মীমাংসার জন্য মূসা (আ.)-এর শরণাপন্ন হয়। তখন মূসা (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে জানান যে, তোমরা একটা গাভী যবেহ করে তার এক টুকরো গোশত এই মৃত ব্যক্তির গায়ে স্পর্শ কর, তাহলে সে জীবিত হয়ে নিজের মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য নিজেই প্রকাশ করে দিবে। তারা তখন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে মূসা (আ.)-এর সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হল। যেমন, গাভীটি কেমন হবে, তার রং কী, তার বয়স কেমন ইত্যাদি। আল্লাহর পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে তখন গাভীর যতগুলো গুণাগুণ বর্ণনা করা হল, তার প্রথমটি হল- إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ 'গাভীটি বয়সে বৃদ্ধও হবে না আবার বাছুরও হবে না। এর মধ্যবর্তী যৌবন বয়সের হতে হবে'।[৫] অবশেষে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা মূসা (আ.)-এর সকল শর্ত মেনে যখন গাভীটি যবেহ করে তার এক টুকরো গোশত মৃত ব্যক্তির শরীরে স্পর্শ করল, তখন মৃত ব্যক্তি কিছু সময়ের জন্য জীবিত হয়ে বলল যে, তার আপন ভাইপোই তাকে হত্যা করেছে। এভাবেই আল্লাহ্ ওই ব্যক্তির হত্যার প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করে দিলেন। ফলে দু'টি গোত্র সাক্ষাত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের হাত থেকে রক্ষা পেল।

এখানে লক্ষণীয় যে, একটি সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে মূল্যবোধহীন, নৈতিক অবক্ষয়ক্লিষ্ট এক বিপথগামী যুবকই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আবার ওই পরিস্থিতি থেকে সমাজের মানুষকে নিষ্কৃতি প্রদানের অসীলা হিসাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি মধ্যম বয়সী প্রাণীকে নির্বাচন করা হয়। অর্থাৎ যুবশক্তি এমন এক শক্তি, যা ভাঙতেও পারে আবার গড়তেও পারে। নদীর জোয়ারের পানিতে পলি থাকে, যা জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে, ক্ষেতে ফসল ভাল হয়। কিন্তু জোয়ারের অতিরিক্ত পানিকে নদীর দু'পাড়ে বাঁধ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে জমিতে অতিমাত্রায় পলি জমে ফসল নষ্ট করে; অনেক ক্ষেত্রে বাঁধভাঙা পানি নদীর দু'কুল ছাপিয়ে সমগ্র এলাকা প্লাবিত করে ফসল, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি সবকিছু তছনছ করে দেয়। অনুরূপ, মানব দেহের যৌবনকালকে যারা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারে, উপযুক্ত কাজে লাগাতে পারে তারাই সফল। আবার জাগতিক মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যারা যৌবন নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়, তাদের সমগ্র জীবনটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়।

---

৪. সূরা বাকারা, আয়াত নং ৭২।
৫. সূরা বাকারা, আয়াত নং ৬৮।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের আত্মোৎসর্গের গুরুত্ব আরো বেশী পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে 'আসহাবুল উখদূদে'র সেই যুবকের কাহিনীতে। ঘটনাটি সংক্ষেপে এরূপ- পূর্ব জামানায় এক রাজা তার রাজ্যের মেধাবী এক যুবককে রাজ্যের স্বার্থে যাদুবিদ্যা শিক্ষার জন্য তারই বয়োবৃদ্ধ যাদুকরের নিকটে পাঠায়। ছেলেটি যাদুবিদ্যা শিক্ষার পাশাপাশি যাতায়াতের পথে এক ঈসায়ী পাদ্রীর নিকটেও নিয়মিত সবক নিতে থাকে। সঙ্গত কারণেই যুবকের মনে প্রশ্ন সরাক্ষণ উঁকি মারে, কোন্ বিদ্যা সত্য? যাদুবিদ্যা, না কি ঈসায়ীবিদ্যা? একদিন ওই যাতায়াতের পথে বিরাট এক হিংস্র জন্তু এসে মানুষের চলাচলের পথ রুদ্ধ করে রাখে। ছেলেটি তখন ভাবে আজ আমি পরখ করে দেখবো ঈসায়ীবিদ্যা সত্য, না কি যাদুবিদ্যা সত্য। সে তখন একটি পাথরের টুকরো হাতে নিয়ে বলে, 'হে আল্লাহ্! পাদ্রীর কর্ম যদি যাদুকরের কর্মের তুলনায় আপনার নিকটে অধিক পছন্দনীয় হয়, তবে এ জন্তুটিকে মেরে ফেলুন'। এই বলে সে পাথরটি নিক্ষেপ করল; ফলে এই ছোট্ট পাথরের আঘাতে জন্তুটি মারা গেল। বিষয়টি রাস্তার উভয় পাশে অপেক্ষমান জনগণ দেখল, এই আশ্চর্য ঘটনাটি সর্বত্র জানাজানি হয়ে গেল। জনগণ বিশ্বাস করতে লাগল যে, এই যুবকের অলৌকিক ক্ষমতা আছে। তখন অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীসহ বিভিন্ন রোগীরা ছেলেটির কাছে তাদের রোগ মুক্তির জন্য আসত। ছেলেটির কথা মত যখন তারা আল্লাহর উপর ঈমান আনত, তখন সে তাদের রোগ মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকটে দো'আ করত, তাদের রোগ ভাল হয়ে যেত। এক পর্যায়ে ওই রাজার পরিষদের এক অন্ধ পারিষদ নিজ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার আশায় ছেলেটির নিকটে গিয়ে তার কথা মত আল্লাহর উপর ঈমান আনল, ছেলেটি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকটে দো'আ করলেন, আল্লাহর রহমতে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। পরের দিন যখন সে রাজ দরবারে গেল, তখন রাজা তাকে জিজ্ঞেস করল, কে তোমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিল? সে বলল, আমার রব। রাজা বলল, আমি ছাড়া তোমার রব কে? সে তখন বলল- رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ 'তোমার ও আমার রব আল্লাহ্'। তখন রাজা তাকে গ্রেফতার করে অমানুষিক নির্যাতন করতে লাগল। অবশেষে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ছেলেটির কথা বলে দেয়। রাজা তখন ছেলেটিকে গ্রেফতার করে তাকেও নির্মমভাবে নির্যাতন শুরু করে। এক পর্যায়ে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ছেলেটি বাধ্য হয়ে পাদ্রীর খবর রাজাকে বলে। রাজা তখন পাদ্রীকে গ্রেফতার করে তার দ্বীন ত্যাগ করতে বলে। কিন্তু রাজার প্রস্তাবে পাদ্রী অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে তাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত করাতে চিরে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে। একই কারণে একই পরিণতি ভোগ করতে হয় রাজার পরিষদের লোকটিকেও। একই প্রস্তাবে ছেলেটিও যখন দ্বীন ত্যাগে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তখন তাকে কিছু সৈন্যের সাথে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় তুলে সেখান থেকে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ছেলেটি তখন আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে ছোট্ট একটি কথা বলেন- اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ 'হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে পার ওদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর'। তখন আল্লাহর অশেষ রহমতে পাহাড় কেঁপে উঠল, ফলে তার সঙ্গীরা পাহাড়ের চূড়া হতে নিচে পড়ে মারা যায়, কিন্তু ছেলেটি প্রাণে রক্ষা পায়। দ্বিতীয় বার তাকে নৌকায় করে সাগরের মাঝখানে নিয়ে পানিতে ফেলে মারার নির্দেশ দেয়। ছেলেটি এবারও আল্লাহর নিকটে একই কথা বলে নিজেকে রক্ষার আকুতি পেশ করে। ফলে সেখানেও যারা তাকে নিয়ে গেল ঝড়-তুফানের কবলে পড়ে তাদের সলীল সমাধি হল, কিন্তু আল্লাহর খাস রহমতে ছেলেটির কিছুই হল না। রাজার এই হতবিহ্বল অবস্থা দেখে ছেলেটি তখন রাজাকে বলল, আমাকে মারতে হলে আমার নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে, অন্যথা আমাকে হত্যা করতে পারবে না। সে তখন রাজাকে বলল, একটি ময়দানে রাজ্যের সকল জনগণকে সমবেত কর। তাই করা হল। অতঃপর ছেলেটি বলল, এবার আমাকে শূলের উপর উঠাও এবং আমার তীরদানী হতে একটি তীর নিয়ে ধনুকের মাঝখানে রেখে বলো- بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ 'ছেলেটির রব আল্লাহর নামে তীর মারছি' বলে তীর নিক্ষেপ কর। ছেলেটির কথা মত যখন রাজা কাজ করল, তখন তীরটি যুবকের কানের গোড়া দিয়ে মাথায় প্রবেশ করল, অতঃপর ছেলেটি মারা গেল।

এই দৃশ্য দেখে ময়দানে উপস্থিত সকল জনতা বলে উঠল- آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ 'আমরাও ছেলেটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম'। যে আশঙ্কায় ভীত হয়ে রাজা পাদ্রী, নিজ পরিষদের অভিজ্ঞ সদস্য এবং এই ছেলেকে হত্যা করল; শেষ পর্যন্ত হিতে বিপরীত হয়ে সেই আশঙ্কারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটল। রাজা তখন প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী মানুষগুলোকে ধরে ধরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মারল।[৬]

ঘটনাবহুল বিস্তারিত হাদীসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে, ছেলেটি যদি তার মৃত্যুর কৌশল রাজাকে না বলত, তাহলে শত চেষ্টা করেও রাজা তাকে হত্যা করতে পারত না। সে যতবার চেষ্টা করত আল্লাহ্ ততবার তাকে সাহায্য করতেন, রক্ষা করতেন, এটা প্রমাণিত। তাহলে কোন্ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ছেলেটি নিজেই নিজের মৃত্যু কৌশল রাজাকে প্রকাশ করল? চেতনা একটাই, সেটা হল দ্বীনের প্রচার। ছেলেটি ইচ্ছা করলে রাজ দরবারে আবদ্ধ পরিবেশেও রাজাকে এটা বলতে পারত, তাতে আল্লাহর প্রভুত্বের দাওয়াত জনতার নিকটে পৌঁছাত না।

মুসলমানদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আনন্দের অনুষ্ঠান ঈদুল আযহা, যার সিংহভাগ স্থান দখল করে আছে ইবরাহীম (আ.)-এর জীবন কাহিনী। পবিত্র কুরআনে সেই ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যখন তিনি পৌত্তলিক সমাজে তাদের হাতে গড়া মূর্তিকে বাদ দিয়ে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিলেন, তখন নানা অযুহাতে তারা বার বার তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল। এক পর্যায়ে তিনি তাদেরকে মাটির তৈরি দেব-দেবীর অসারতা প্রমাণের নিমিত্তে দেব-দেবীগুলোকে ভেঙে তছনছ করে দিলেন। যখন তারা মেলা থেকে ফিরে তাদের দেবদেবীর এই বেহাল দশা দেখল, তখন তারা বলাবলি করতে লাগল, এ কাজ কে করতে পারে? তখন কিছু লোক বলল, 'আমরা ইবরাহীম নামে এক যুবককে এদের সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করতে শুনেছি'।[৭] অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.) যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত শিরক তথা মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলেন, তখন তিনি ছিলেন এক টগবগে যুবক। মূলত, তারুণ্যের আপসহীন উন্মাদনায় একক ব্যক্তি হয়েও জগদ্দল পাথরের মত জেঁকে বসা শিরকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে তাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

'আসহাবে কাহাফে'র সেই যুবকদের কাহিনী তো সকলেরই জানা, যারা তৎকালীন সমাজে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত শিরকি ধর্মমতের বিরুদ্ধে এক আল্লাহয় বিশ্বাসী হওয়ার কারণে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। অবশেষে ঈমান রক্ষার তাগিদে তারা দেশান্তরিত হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিশেষ কৌশলে আল্লাহ তাদেরকে কয়েক'শ বছর ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, 'আপনার নিকটে তাদের ইতিবৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি, তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আর আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম'।[৮] ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে যখন পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানীর পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পুত্রকে প্রস্তাব করলেন, يَابُنَيَّ إِنِّيْ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى 'হে পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি; এখন তুমি তোমার মতামত ব্যক্ত কর'। তখন যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র অকপটে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বললেন, يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ 'হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তা প্রতিপালন করুন; আল্লাহ চাইলে আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন'।[৯] তখন পুত্র ইসমাঈল ছিলেন একজন তরুণ।

---

৬. মুসলিম, হাদীস নং ৭৭০৩।
৭. সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং ৬০।
৮. সূরা কাহাফ, আয়াত নং ১৩।
৯. সূরা সফফাত, আয়াত নং ১০২।

নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রারম্ভিক সময়ে রাসূল (সা.) মক্কার কুরায়েশদের মাঝে অত্যন্ত সংগোপনে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত শুরু করেন। কিন্তু যেদিন ওমর ইসলাম গ্রহণ করলেন, সেই দিন থেকেই প্রকাশ্যে মক্কার অলিতে-গলিতে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া শুরু হয়ে গেল। ইসলাম গ্রহণের পর ওমর (রা.) বললেন, আর গোপনে নয়, এখন থেকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। এই বলে প্রকাশ্যে মুসলমানদের একটি মিছিল বের হল, যার সম্মুখ সারিতে রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে ছিলেন একজন যুবক, যার নাম ওমর। চল্লিশ জন সদস্যের ক্ষুদ্র মিছিলটি সেদিন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তাকবীর 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে মক্কার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে কাবা প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হল। মিছিলের নেতৃত্বে তারুণ্যের উন্মাদনায় ভরপুর তেজদীপ্ত টগবগে যুবক ওমরকে দেখে কুরায়শ নেতারা যার পর নাই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হল। দু'দিন আগেও যে ওমর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহর গর্দান নেওয়ার জন্য নাঙ্গা তরবারি হাতে ঘুরে বেড়াত, সেই ওমরই আজ তার প্রধান সঙ্গী? মিছিলে নেতৃত্ব দান কালে ওমর (রা.) বলিষ্ঠ কণ্ঠে এই বলে ঘোষণা দিচ্ছিলেন, সাবধান! কোনো মুসলমানের কেশাগ্র স্পর্শ করলে ওমরের তরবারি আজ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে।

ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু আবু জাহালকে হত্যা করেছিল দুই উদীয়মান তরুণ; যাদের নাম মু'আয ও মুয়াওওয়াজ। আব্দুর রহমান বিন আওফ বলেন, বদরের যুদ্ধে সৈনিকদের কাতারে দাঁড়িয়ে এক পর্যায়ে দেখি আমার ডানে ও বামে দুই তরুণ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখে আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করলাম না। এ সময় একজন আমাকে অনুচ্চস্বরে বলল, 'চাচাজী! আমাকে আবু জাহালকে দেখিয়ে দিন তো? আমি বললাম, তাকে তোমরা কী করবে? তারা বলল, আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি দেখামাত্রই তাকে হত্যা করব। আব্দুর বিন আওফ বলেন, আমি ইশারায় আবু জেহেলকে দেখিয়ে দেওয়া মাত্রই তারা দু'জন শিকারি জন্তুর মত ক্ষিপ্রগতিতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করল। অতঃপর দু'জনেই রাসূল (সা.)-এর নিকটে গিয়ে আবু জাহালকে হত্যার দাবী পেশ করলে, তিনি উভয়ের তরবারিতে রক্ত দেখে বললেন, তোমরা দু'জনেই তাকে হত্যা করেছ।

অপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে ওহুদের যুদ্ধে ওসামা সৈনিক হিসাবে নির্বাচিত না হওয়ায় অত্যন্ত মনঃকষ্ট নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। কিন্তু পরের বছর খন্দকের যুদ্ধে সৈন্য বাছাই পর্বে বাদ পড়ার ভয়ে ওই ওসামা নিজেকে লম্বা প্রমাণ করার মানসে পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তার এই আগ্রহ দেখে রাসূল (সা.) তাকে যুদ্ধের জন্য নির্বাচিত করলেন। তখন ওসামা মাত্র ১৪ বছর বয়সী যুবক ছিলেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুবকদের ভূমিকা নিয়ে এমনিভাবে বহু উদাহরণ পেশ করা যাবে।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, যৌবনকাল মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। তাই যৌবনকালকে যথাযথভাবে মূল্যায়নে রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে যথেষ্ট সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যেমন- যৌবনকালের জবাবদিহিতা সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে রাসূল (সা.) বলেন, ক্বিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে প্রভুর সম্মুখে কোনো আদম সন্তান এক ধাপও সামনে অগ্রসর হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা ৫টি প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। প্রথমেই তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনের হিসাব চাইবে, অতঃপর তার যৌবনকাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, عَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ অর্থাৎ তুমি তোমরা যৌবনকালটা কীভাবে অতিবাহিত করলে?[১০] যদিও সারা জীবনের হিসাবের মধ্যে যৌবনকালও বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সেই যৌবনকালের হিসাব আল্লাহর দরবারে আলাদাভাবে দিতে হবে। অপর এক হাদীসে যৌবনকালের পুরস্কারস্বরূপ রাসূল (সা.) বলেন, কোনো যুবক যদি দুনিয়াবী যিন্দেগীতে লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাস, যেনা-ব্যভিচার, সুদ-ঘুষ, জুয়া-লাটারি, চুরি-

১০. তিরমিযী, হাদীস নং ২৪১৬।

ডাকাতি, সন্ত্রাসী-লুটতরাজ ইত্যাকার সকল প্রকার শয়তানী অসওয়াসা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে তার যৌবন শক্তিটা ইলাহী বিধানের অনুকূলে ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করতে পারে, তাহলে ক্বিয়ামতের কঠিন মুহূর্তে যেদিন মানুষ নিজের ঘামে হাবুডুবু খাবে, যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, সেই ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময় মুহূর্তে যে সাত শ্রেণির মানুষ আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় লাভে ধন্য হবেন, তাদের দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত হলেন যুবসম্প্রদায়।[১১] এই মহা পুরস্কারের কথা বলে পুরস্কারের আশায় যৌবনকালটা ভালোভাবে অতিবাহিত করার মানসে তিনি বলেন, 'পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে পাঁচটি বিষয়কে গনীমত মনে কর। ১. বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, ২. অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, ৩. ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে, ৪. দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে এবং ৫. মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে'।[১২] এখানেও যৌবনকালটাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লিখিত হাদীসসমূহের ভাষ্যমতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে যৌবনকালের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। শেষ বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে চাইলে সময় থাকতেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশেষ করে যুবসমাজকে দায়িত্ব সচেতন হতে হবে। অন্যথায় সেদিন চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার বিকল্প থাকবে না।

এদেশের দুনিয়ামুখী ভোগবাদী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, বিকৃত আকাশ সংস্কৃতির নগ্ন ছোবল, যৌন সুড়সুঁড়ি দানকারী নোংরা, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য, মদ-জুয়া-লটারি, ইয়াবা-হেরোইনের মত নিত্য-নতুন নেশা জাতীয় দ্রব্য, ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন শিক্ষাব্যবস্থা, ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলীয় স্বার্থে ছিনতাই, চাঁদাবাজি, হত্যা ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে প্রতিনিয়ত যুবচরিত্রকে ধ্বংস করে জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। এহেন অবক্ষয়ক্লিষ্ট যুবসমাজ কখনই জাতির ভবিষ্যত হতে পারে না। একটি শান্তিপূর্ণ সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ, দেশ ও জাতি গঠনে যুবসমাজকে এহেন অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষার কোনো বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যে প্রয়োজন লোভ-লালসা মুক্ত একটি আখেরাতমুখী যুবশক্তি তৈরী করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সুযোগ্য নির্দেশনায় এদেশের একমাত্র তাওহীদী যুবকাফেলা 'জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ' সারাদেশে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় যে কাজ করে চলেছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

এদেশের বিপথগামী যুবকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের জান ও মালকে জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তাই মিথ্যা মরীচিকার পিছনে না দৌড়িয়ে সময় থাকতে আল্লাহর দেওয়া পবিত্র আমানত যৌবন শক্তিকে আল্লাহর দেওয়া বিধান মতো পরিচালনা করে ব্যক্তি, সমাজ ও দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করি। যুগে যুগে যুবসমাজের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে অনুপ্রাণিত হই; সর্বোপরি আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জান, মাল ও সময় ব্যয় করি। সাথে সাথে পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে জান্নাতের পথ সুগম করি। হে যুবক! স্মরণ কর সেই দিবসের কথা, যেদিন কোন টাকা-পয়সা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ধন-দৌলত কোন কাজে আসবে না। সেদিন একমাত্র সহায়ক শক্তি হবে নেক আমল। তাই সময় থাকতে দুনিয়াবী জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভূলুণ্ঠিত করে পরকালীন জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করি। জীবনের যৌবনকালটাকে যথাযথ মূল্যায়ন করি। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন। আমীন!!

১১. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীস নং ৭০১।
১২. তিরমিযী, মিশকাত, হাদীস নং ৫১৭৪।

ইসলামী সংগঠনগুলোর ঐক্যের অন্তরায় : দূরীকরণের কিছু উপায়

প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। বাংলাদেশের যত ইসলামী সংগঠন আছে ততো সংগঠন বিশ্বের অন্য কোনো দেশে আছে কি না আমার জানা নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম-এর একটি বাণী আমার উম্মত ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে। এর মধ্যে একদল হবে নাজাতপ্রাপ্ত।

আমাদের দেশে যত ইসলামী সংগঠন আছে আমরা সবাই নাজাতপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত বলে শুধু মনেই করি না মোটামুটি দাবিও করি। এজন্য আমি আমার নাজাতপ্রাপ্ত দল/সংগঠনের নেতাকর্মী হওয়ায় বেহেশতের সার্টিফিকেট পকেটে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে দিনাতিপাত করি।

আমরা ইসলামী সকল সংগঠনের কর্মী থেকে নেতা পর্যন্ত সকলেই এক আল্লাহর ইবাদত করি এক রাসূলের অনুসারী হয়ে একই কুরআন-হাদীস পড়ে তা মানার চেষ্টা করি। অথচ সব দলের মধ্যে উপদলের অভাব নেই।

ইসলামী প্রত্যেক দল-উপদলই বক্তব্য রাখার সময় আল কুরআনের ঐক্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াতটি তিলাওয়াত করে:

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا...

তোমরা আল্লাহর রজ্জু আল-কুরআনকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকো এবং বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ো না। এটি তিলাওয়াত করে বৃহত্তর ঐক্যের ডাক দিয়ে উপদলে বিভক্ত হওয়ার সূচনা করে থাকি। এজন্যই ইসলামী সংগঠনগুলোর মধ্যে দিন দিন দল-উপদলের সংখ্যা বাড়ছে বৈ কমছে না। দেশের বড় বড় ইসলামী সংগঠনের এ নিয়ে কোনো মাথা ব্যথাও নেই। নেই তাদের ঐক্যমতে পৌঁছার ব্যাপারে কোনো চিন্তা-ভাবনা।

<u>আমার দৃষ্টিতে ইসলামী সংগঠনগুলোর ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারার মূল কারণগুলো হলো-</u>

১. **নেতাকর্মীদের ইসলামের সঠিক ধারণা না থাকা :** ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়ার জন্য ঐশ্বী জ্ঞান আহরণ অপরিহার্য। ঐশ্বী জ্ঞান শিক্ষাদান করা হয় সাধারণত মাদরাসাগুলোতে। ইসলামী সংগঠনের অধিকাংশ নেতাকর্মী জেনারেল শিক্ষিত, মাদরাসার নয়। ইসলামের সঠিক ধারণা তাদের মধ্যে না থাকার কারণে ইসলামের সাংগঠনিক সঠিক ধারণা তাদের মধ্যে পর্যাপ্ত থাকে না।

২. **নেতাকর্মীদের ইসলাম যথাযথ না বুঝা:** ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়; এটি একটি পূর্ণ জীবনব্যবস্থার নাম।

ইসলামী সংগঠনের অধিকাংশ নেতাকর্মী এর সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখে না। তারা মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ পড়া, দুই চার পৃষ্ঠা কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদির মধ্যেই তাদের ইসলামের জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে ইসলামের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের বাস্তবায়ন সম্পর্কে তাদের তেমন কোনো ধারণা থাকে না।

৩. **ইসলাম জানা ও মানার লোকসংখ্যা হ্রাস পাওয়া:** ইসলামী দলগুলোর মধ্যে ইসলাম জানা ও মানার সংখ্যা একেবারেই শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। নেতাকর্মীদের পরিবারে ইসলাম সম্পর্কে জানা শোনা এবং মানার সংখ্যা বা পরিমাণ অনুল্লেখ্য। তারা যতটুকু ইসলাম জানেন তার দশ ভাগের এক ভাগও তাদের পরিবারের মধ্যে প্র্যাকটিস হয় না। ইসলামী সংগঠনের নেতাকর্মীগণ সাধারণত তাদের সন্তানদেরকে ঐশ্বী জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়ার জন্য মাদরাসায় পাঠান না। তারা সন্তানকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বানিয়ে অর্থ উপার্জনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন এবং অর্থই সংগঠনের মূল চালিকাশক্তি হিসাবে এখান থেকে একটি অংশ চাঁদা হিসেবে প্রদান করে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন হয়েছে বলে মনে করেন।

৪. **গুণীদের কদর হ্রাস পাওয়া:** সাংগঠনিক জীবনযাপন এটি একজন মুমিনের অপরিহার্য বিষয় মনে করেন–এরকম গুণী মানুষ সব সংগঠনেই আছে। সংগঠনের অনেক নেতা তাদেরকে সাপোর্ট করেন না বরং মনে প্রাণে ঘৃণা করেন। কিন্তু সংগঠন যারা পরিচালনা করেন তারা কিন্তু তাদের মত গুণী নন। সংগঠন পরিচালনা করতে গেলে কিছু নয় ছয় করতেই হয় যেগুলো অনেক মানুষ স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেন না। যার কারণে সাংগঠনিক নেতাদের সাথে গুণী মানুষের দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

৫. **অনুদারতা:** অনুদারতা সাংগঠনিক পর্যায়ের সবচাইতে ক্ষতিকর একটি বিষয়। অনুদারতা সংগঠনকে যত পিছিয়ে দেয় অন্য কোন কিছু ততটুকু নয়। অনুদারতার কারণে আমরা সমমনা পর্যায়ের সংগঠন অথবা বিরোধী সংগঠন কারো সাথেই মানুষ হিসেবে যতটুকু সদাচারণ দরকার সেটাও করতে পারি না এবং করি না। যার কারণে সংগঠন যত ভালো বা সুন্দর হোক, যত ইসলামীই হোক না কেন, সাংগঠনিক ব্যক্তি এবং অন্য সংগঠনের লোকেরা এ সংগঠনকে খুব ভালো চোখে দেখে না, দেখা সম্ভব না।

৬. **সামান্য বিষয়গুলোতে আমরা ছাড় দিতে পারি না:** প্রতিবেশী হিসেবে যে হক যেমন, কোনো বিয়ে-শাদী আচার অনুষ্ঠানে অন্য সংগঠন অথবা অসাংগঠনিকদের আমরা দাওয়াত দিতে পারি না। রাস্তায়

দেখা সাক্ষাৎ হলে সালাম কুশল বিনিময় একজন মুসলমান হিসেবে যে জনদায়িত্ব সেটুকুও আমরা পালন করি না সাধারণত। এ অনুদারতার কারণে দলীয় নেতাকর্মীদের অসাংগঠনিক অথবা অন্য সংগঠনের আত্মীয়-স্বজন ভাই বন্ধু ইসলামী সংগঠনের প্রতি দরদী না হয়ে বিরোধী হয়ে ওঠে।

৭. **অসহনশীলতা:** সংগঠন ইসলামী বা অনৈসলামী যেটাই হোক না কেন আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহনশীল হতে পারি না। সবসময় অসহনশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকি। আমরা একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারি না, একজন আরেকজনের ক্ষতি কামনা করি এবং ক্ষতি করেও থাকি। যেটা পরবর্তীকালে শত্রুতায় রূপ নেয়। বিভিন্ন নির্বাচনের সময় এ বিষয়গুলো সংগঠনের প্রচুর ক্ষতি করে থাকে।

৮. **ইজমের প্রভাব:** যে সংগঠনে যে এলাকা বা যে চিন্তাধারার লোক বেশি থাকে দলে তাদের একটা প্রভাব সব সময় থাকে। তারা একটি বলয় তৈরি করে নেয়। দলে ইলেকশন/সিলেকশন যেটাই হোক না কেন, তারা ভেতরে ভেতরে নিজেদের লোকগুলোকে সিলেকশন দিয়ে থাকে এবং তারা সেভাবে ম্যানেজ করে নিজেরাই দলের নেতা হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে। তারা জানে, নেতার হাতে কিছু আর্থিক বিষয় থাকে যে সুযোগ-সুবিধা এই লোকেরা ভোগ করতে পারবে।

৯. **আনুগত্যহীনতা:** বর্তমানে নেতার প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য আর কোনো সংগঠনেই নেই। কারণ কোনো নেতাই এখন লোভ লালসা ইজম পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত নন। যার কারণে দলের কর্মীরা নেতাকে সেভাবে মূল্যায়ন করেন না। আস্তে আস্তে আনুগত্যের ঘাটতি দেখা দিতে থাকে।

১০. **নেতাকর্মীদের সঠিক ট্রেনিং না থাকা:** কোনো সংগঠনে কর্মী সম্মেলন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নামকা ওয়াস্তে হয়ে থাকে। সেখানে একজন নেতা প্রকৃত নেতা হিসেবে গড়ে ওঠে এ বিষয়ে কোন স্থায়ী এবং কার্যকরী ট্রেনিং সেন্টার কোথাও নেই। কোন কোন সংগঠনের কিছু ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা থাকলেও মোটিভেশন-এর কোন ব্যবস্থা নেই। যার কারণে নেতাকর্মীগণ সঠিকভাবে ট্রেইনড্আপ না হওয়ার কারণে তাদের দলের প্রতি যতটুকু কমিটমেন্ট থাকা প্রয়োজন ততটুকু পরিলক্ষিত হয় না।

১১. **দলীয় গোঁড়ামী:** প্রত্যেক দলেই গোঁড়া কিছু লোক থাকে, যারা সংগঠনের উপকারের চাইতে অপকার বেশি করে। তাদের গোঁড়ামির কারণেই তারা নিজদল ছাড়া অন্য দলের সাথে উঠা-বসা করতে পারেন না। এক টেবিলে বসে চা খেতে পারেন না। তাদের সাথে সালাম কুশল বিনিময় হয় না। তারা একান্তই নিজেদের গণ্ডির মধ্যে থেকে নিজেদের দলকেই শ্রেষ্ঠ এবং সেরা দল হিসেবে বিবেচনা করে থাকে।

১২. **ত্যাগী নেতাকর্মীদের অবমূল্যায়ন:** সব সংগঠনেই ত্যাগী নেতা/কর্মীর সংখ্যা খুব অল্পই থাকে। এরা আসলেই সংগঠনের জন্য নিবেদিত থাকে। সবসময় সংগঠনের সকল বিপদ-আপদে এরা অতন্দ্র

প্রহরীর মত কাজ করে। কিন্তু সংগঠনের কিছু লোক থাকে যারা শুধু কাজ না করে ভাগ বসাতে চায় এবং ভোগও করে। যেহেতু মূল চালিকাশক্তি ওদের হাতে থাকে তাই ত্যাগী নেতাদের এরা মূল্যায়ন করে না।

১৩. **হাইব্রিড নেতাকর্মী:** দলের ত্যাগী কর্মীর চাইতে হাইব্রিড নেতাকর্মীদের প্রভাবটা বেশি থাকে। এরা সবসময় অতি উৎসাহী থাকে এবং এগ্রেসিভ থাকে। দলের বিশেষ কোনো প্রয়োজনে বিশেষ ভূমিকা রেখে দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বর্তমানে এ ধরনের নেতাকর্মীদের আবার পছন্দ করে। পরবর্তীতে দলের বিপদে বা আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এ ধরনের নেতাকর্মীরা বিরোধী দলের সাথে দূরে থাক সমমনা সংগঠনের সাথেও ঐকমত্য বিষয়ে কথা বলবে তো দূরের কথা তাদের সঙ্গে বসে এক কাপ চা গ্রহণেও তারা দ্বিধাবোধ করে।

ইসলামী বিভিন্ন দলের ঐকমত্যে পৌঁছতে হলে আমার দৃষ্টিতে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা একান্ত অপরিহার্য।

১. আল কুরআন ও আল হাদীস প্রতিটি সংগঠনের মূল উৎস হতে হবে।

২. ইসলামের মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে।

৩. প্রত্যেক দলের মৌলিক নীতিমালা পর্যালোচনা করে তুলনামূলকভাবে কাছাকাছি সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করতে হবে।

৪. ধর্মতাত্ত্বিক তথা মাযহাবী কোনো মতানৈক্য এখানে স্থান দেওয়া যাবে না।

৫. সকল দলের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতে হবে।

৬. ধর্মীয় এবং দলীয় গোড়ামী পরিত্যাগ করতে হবে।

৭. সকলকে সকল ধরনের ইজম মুক্ত থাকতে হবে।

৮. ঐক্যে ফাটল ধরে এমন যেকোনো ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

৯. বিভিন্ন অনুষ্ঠান/উপলক্ষ্যে দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একত্রিত হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একত্রে কোনো তারবিয়ত বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, নিন্দা, কাদা ছোড়াছড়ি পরিহার করতে হবে।

এ বিষয়গুলো বিবেচনায় আনলে আশা করি, দল-মত নির্বিশেষে সকল সংগঠনের লোক একত্রিত হয়ে দেশ-জাতি ও ইসলামের স্বার্থে কাজ করে যেতে পারবে। অন্যথায় এভাবে আলাদা হয়ে হাজার বছর সাধনা করলেও দেশ জাতির ক্ষতি বৈ কোনো উপকার হবে না।

কর্মীর চোখে শুব্বান

মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক

সকল প্রশংসা নিবেদিত জগতসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী, সকল নবী-রাসূলের নেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর। স্মরণ করছি তাদের যারা আজ পর্যন্ত দীন কায়েমে দাওয়াতী ও জিহাদী ময়দানে তৎপর থেকেছেন, ঘাম-রক্ত ঝরিয়েছেন, জীবন বিলিয়েছেন। আরো স্মরণ করছি নাম না জানা সেসকল মর্দে মুজাহিদদের যারা ভারতীয় উপমহাদেশে কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত অনুসারী হওয়ার জোয়ার এনেছেন, গড়ে তুলেছেন তাওহীদী তামাদ্দুনী জনপদ। আল্লাহ তাদের সকলকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদায় আসীন করুন। আমীন।

সংগঠন নিয়ে আমার বিভিন্ন স্মৃতি ও অনুভূতি এই নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। তার আগে কুরআনুল কারীম থেকে দু'একটি আয়াতে কারীমা তুলে ধরতে চাই।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

অনুবাদঃ আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং, তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করেছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। (সূরা আত-তাওবাহঃ ১১১)

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

অনুবাদঃ মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন। তওরাতে এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা এরূপ যেমন, একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে-চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে-যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। (সূরা আল-ফাতহঃ ২৯)

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

অনুবাদঃ যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (সূরা আল-হাশরঃ ৯)

আমার সাংগঠনিক স্মৃতি ও অনুভূতি

এক. দেশের অন্যতম প্রাচীন জেলা রংপুরের সদরে আমার জন্ম। ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে আহলে হাদীস জামে মসজিদে প্রায়ই যাওয়া হতো। বিশেষ করে ঈদুল আযহার একদিন বা দু'দিন পর জামেয়া সালাফিয়া মাদরাসা সংলগ্ন ওই মসজিদ প্রাঙ্গণে দুঃস্থ-অসহায়দের মাঝে ঈদের খুশি ভাগাভাগি করতে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর পক্ষ থেকে গরু-ছাগল কুরবানী করে গোশত বিলানো হতো। বেশ কয়েকবার ঈদের আগ থেকে কুরবানী পর্যন্ত সেই কুরবানীর ছাগল দেখাশুনার দায়িত্ব পড়তো আমার আর আমার চাচাতো ভাইয়ের ওপর। বয়স তখন ৮-১০ হবে। এ যে গুরুভার! একবার তো দু'টো ছাগল হারিয়েই গেলো! তখন সেকি কান্না আমাদের! আল্লাহ সহায় ছিলেন বলে শহরগামী এক লোক সেগুলো পেয়ে খোঁজ করে বাড়িতে ফেরৎ দিয়ে গিয়েছিলেন! এর পর তা যথাসময়ে কুরবানী করা হয়। কোনো সংস্থা বা সংগঠনের পক্ষ থেকে এরকম ভালো উদ্যোগ আমার প্রথম দেখা। সেসময় রংপুর জেলাসহ বিভিন্ন জেলার দুঃস্থ-অসহায় ও দুর্গত এলাকার মুসলিম ভাইদের জন্য ঈদে গরু যবাই করে বিতরণ করা হতো। রমাযান মাসে অনেক মসজিদ কেন্দ্রিক পুরো মাসের ইফতার কর্মসূচি অব্যাহত ছিল। তখন ঢাকার যাত্রাবাড়ি মাদরাসার ছাত্র ভাইদেরকে দাঈ হিসেবে সেই মসজিদে প্রেরণ করা হতো। আমাদের স্থানীয় মসজিদেও এরকম ইফতার কর্মসূচি কয়েক বার বাস্তবায়িত হয়েছে।

বাবা জেলা শহর এলাকা জমঈয়তের নিবেদিত কর্মী হওয়ার সুবাদে সংগঠনের তৎকালীন মাননীয় সভাপতি প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী স্যারকে তখনই প্রথম দেখা। আমার বাবা তাঁর অন্যতম ঘনিষ্টজন ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় কাজে কিংবা সাংগঠনিক কাজে রংপুর সফরে এলে বাবাকে ডেকে নিতেন। বাবাও তাঁকে সঙ্গ দিতে ব্যস্ত থাকতেন। বাবার কাছে তাঁর অনেক গল্প শুনে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাই। বোঝার চেষ্টা করি। এর পর প্রাথমিকের পাঠ শেষে যখন আল-জামেয়া আস-সালাফিয়ায় ভর্তি হই তখন কেন যেনো সেখানে জমঈয়তের অনুকূল ও ইতিবাচক পরিবেশ পাইনি, যদিও সংগঠনের জেলা অফিসটি মসজিদ সংলগ্ন। এর কারণ হয়তো অনেক রয়েছে, আমি সেদিকে যাচ্ছি না।

দুই. ১৯৯৭-২০০৩ পর্যন্ত মাদরাসা জীবনের এই সাত বছরে উল্লেখযোগ্য সাল হলো ১৯৯৮। এ বছর সউদীআরব থেকে পরিচালিত 'তাদরীবুল মুআল্লিমীন ওয়াদ্ দুআত' ঢাকার যাত্রাবাড়িতে অনুষ্ঠিত না হয়ে রংপুরস্থ আল-জামেয়া আস-সালাফিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। তাদরীবে যারা ভালো রেজাল্ট করবেন তারা সউদী

আরবের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবেন বলে জেনেছিলাম। সেই পরীক্ষায় মাহবুবুর রহমান নামে এক বড় ভাই প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। এর পর থেকে মাদরাসায় জমঈয়ত ও তার অঙ্গসংগঠন-এর আনাগোনা বাড়তে থাকে। এর আগ পর্যন্ত মাদরাসায় কেবল সমমনা অন্য সংগঠনের নাম ও কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যেতো। যদিও এ প্রতিষ্ঠান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী স্যারের হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৯৯ সালের মাঝামাঝি অথবা শেষদিকে আল-জামেয়া আস-সালাফিয়াহ্‌র শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলেন মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন ভাই। তিনি মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া থেকে ফারেগ হয়ে সুদূর রংপুরে এসে কর্মস্থল স্থির করলেন। এবার মাদরাসায় শুরু হলো জমঈয়তের যুবসংগঠন শুব্বানের তৎপরতা। মাদরাসায় কমিটি গঠন করা হবে, কমিটির তালিকায় আমার নাম রাখার প্রস্তাব করা হলে তিনি বললেন, ওকে নিয়ে আমার ভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে। আমার আর মাদরাসায় সংগঠন করা হলো না। তার ইচ্ছে ছিল– আমাকে দিয়ে আমার এলাকার মসজিদভিত্তিক শুব্বান কমিটি গঠন করা। কারণ রংপুরে যাওয়ার পর তিনি প্রায়ই আমাদের সেই মসজিদে জুমআর খুতবা দিতেন। (জমঈয়তের সাবেক সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুন নূর মাদানীও প্রায়ই ওই মসজিদে খুতবা দিতেন।) সুতরাং, সেই এলাকা নিয়েও তার সাংগঠনিক পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তিনি আমার এলাকার মসজিদে কমিটি গঠন করার পূর্বেই কী এক অজ্ঞাত কারণে আবার ঢাকায় চলে গেলেন! অনেক পরে জানলাম, কেন্দ্রীয় শুব্বান গুরু দায়িত্ব প্রদান করায় চাকরি ছেড়ে তাকে ঢাকায় নিয়মিত হতে হয়েছে। আমার দেখা শুব্বানের নিবেদিত কর্মী ও নেতার মধ্যে তিনি ব্যতিক্রম। তিনি অত্যন্ত যোগ্য ও উচ্চশিক্ষিত হয়েও তার ক্যারিয়ার বিসর্জন দিয়েছেন কেবল সংগঠনের জন্য। তিনি যখন যে এলাকায় গিয়েছেন সংগঠন নিয়ে ভেবেছেন, নির্মোহে সংগঠন গড়ার চেষ্টা করেছেন।

তিন. ২০০৩ সালের ৬ ডিসেম্বর। বাবা আমাকে সাথে নিয়ে ঢাকায় এলেন। উদ্দেশ্য– মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়াতে ভর্তি হওয়া। ভর্তির জন্য জেলা জমঈয়ত সভাপতি ও সেক্রেটারির সুপারিশ নিয়ে এসেছিলাম। যথারীতি ভর্তি সম্পন্ন হলো। এখানে এসে পেলাম সেই কাঙ্ক্ষিত শুব্বানের দুর্বার কর্মসূচি ও অনুকূল উর্বর পরিবেশ। সুযোগ হলো শুব্বানকে নিবিড়ভাবে জানার। পেলাম প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলবৃন্দের সাথে পরিচিত হওয়ার দুর্লভ সুযোগ। সেসময় মাদরাসার ছাত্র সংসদের সভাপতি ছিলেন শাইখ নুরুল আবসার ভাই। তিনি চট্টগ্রামের হাটহাজারি মাদরাসা থেকে দাওরা শেষ করে আবার এখানে সানাবিয়া তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন শুনে অবাক হয়েছি। আহা কী তার ধৈর্য! নেতা হিসেবে তিনি ছিলেন অমায়িক, মানুষ হিসেবেও তেমনি। এমন নিষ্পাপ ও গম্ভীরভাবে চলতেন যে, শ্রদ্ধায় তার প্রতি নত হতো সবাই। শিক্ষকদের অনেককে দেখেছি তার সাথে সম্মান দিয়ে কথা বলতে! এককথায়, মাটির মানুষ। ভাইকে আজ পর্যন্ত কখনো রাগতে দেখিনি।

চার. শুব্বানের আরাবীয়া জেলা শাখার বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সাংগঠনিক কার্যক্রম বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে চালানো হতো। একটি গ্রুপ পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন জামালপুরের আব্দুর রহমান ভাই। তিনি

গ্রুপভিত্তিক মনিটরিংয়ের পাশাপাশি কর্মীদের নিয়মিত ব্যক্তিগত কন্টাক্ট করতেন। আমার নিকট ব্যক্তিগত টার্গেটে কর্মী গঠনের উদাহরণ শুব্বানে প্রথম তার মাঝেই পরিলক্ষিত হয়। মাদরাসার ১১৫ নম্বর রুমে সিট হওয়ায় খাওয়ার আগে পরে অন্যান্য রুমের অনেক বড়ো-ছোটো ভাইয়ের আড্ডা ছিল সেখানে। কিন্তু তিনি এসে অহেতুক গল্প না করে আমার রিপোর্ট বই চেক করতেন। বিভিন্ন পরামর্শ দিতেন। ভাইয়ের সাথে অনেকদিন দেখা নেই; দুঃখজনক যে, কথাও হয় না আর!

পাঁচ. আরেফ হওয়ার পর যৌথভাবে রাজশাহীর ইসরাফিল হোসেন ভাইয়ের সাথে গ্রুপ পরিচালনা করতে গিয়ে বিড়ম্বনায়ও পড়তে হয়েছে। সহপাঠীদের কাউকে কাউকে আমাদের গ্রুপে দেওয়াতে তাদেরকে সংগঠন বুঝানো কিংবা ফলোআপ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তারপরও আলহামদুলিল্লাহ, কাজ করেছি। সহপাঠী দিনাজপুরের আনোয়ারুল্লাহকে সংগঠন বুঝার ক্ষেত্রে খুব আগ্রহী পেয়েছি।

ছয়. ২০০৫ সালে শুব্বানের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হলো। গন্তব্য কক্সবাজার। সেটি আমাদের জন্য ছিল এক ফালি চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো। আমরা কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের খুব কাছাকাছি পেলাম। পেলাম মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ ভাইকেও (বর্তমান ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ, মুফাসসির, সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা)। সফর শুরুর পূর্বে মসজিদে গোলাম রহমান ভাইয়ের নির্দেশনা আমাদের কাছে গুরুআদেশ শিরোধার্যের মতো ছিলো। চট্টগ্রাম পার হলে ডাকাতদল না কি আমাদের বাস আটকানোর চেষ্টাও করেছিল! শিক্ষা সফর বাস্তবায়নে অন্যান্যদের মধ্যে রংপুরের হাফেয সোহাইল আহমাদ ভাইকে বেশ কর্মঠ ও তৎপর মনে হয়েছে। দুই রাত একদিনের ওই সফর এখনো স্মরণীয়। কারণ, সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় শুব্বান সেখানে আয়োজন করল উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার। বিরামহীন শিক্ষাসফরকে প্রকৃতরূপেই শিক্ষণীয় করার প্রয়াস! অবিশ্বাস্যভাবে আমি তাতে প্রথম হলাম। আর বগুড়ার জাহিদ হাসান ভাই হলেন দ্বিতীয়। তৃতীয় জনের নাম এখন মনে নেই! সেই প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত পুরস্কার আজও আমার বাড়িতে সংরক্ষিত আছে।

সাত. মাদরাসার ছাত্র সংসদ ও মাদরাসা জেলা শাখার মাসিক বৈঠকগুলোতে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত হতেন। বিশেষ করে চাপাইনবাবগঞ্জের ওবায়দুল্লাহ ফারুক ভাই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র মোছাদ্দেক ভাই ও ময়মনসিংহের আব্দুল্লাহ আল মোতী ভাই। তাদের আলোচনা মনে দাগ কেটেছে। ওবায়দুল্লাহ ভাই সংগঠনের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন জানি। তাকে দেখে আগাগোড়াই সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব মনে হতো। ছাত্ররা ভাইকে ভয়ও পেতাম। আব্দুল্লাহ মোতী ভাইকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে আরো কাছে থেকে জানার সুযোগ হয়েছিল। সাংগঠনিক চেতনায় কয়েকবার ভাইয়ের শহীদুল্লাহ হলের এক্সটেনশনে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। ওই ভাইয়ের সহযোগিতায়ই আমার হলের আহলে হাদীস ভাইদের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। ২০০৮ সালে হলে ওঠার সুযোগও হয়েছিল তাদের চেষ্টায়। যদিও মাত্র একটি বছর হলে থাকার সুযোগ হয়েছে! এর পরই আমাকে হল থেকে বের করে দেওয়া হলো। অপরাধ? সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্ষমতাসীন দলের জনৈক ছাত্রনেতাকে সালাম না দেওয়া এবং আমার বইয়ের শেলফ ও ট্রাঙ্কে থাকা কিছু বই ও শুব্বানের প্রাত্যহিক রিপোর্ট বই রাখা। সেদিন

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী কিংবা তৎকালীন আইন অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. এরশাদুল বারী স্যারের পরিচয় দিয়েও কাজ হয়নি। এর পর ভয়াতুর হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাকি জীবন পার করতে হয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশ ও ঈমানী দুর্বলতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শুব্বানের কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে পালন করা হয়ে ওঠেনি। উল্লেখ্য, সালেক মানে উত্তীর্ণ হয়ে ২০০৬ সালে আরাবীয়ার ছাত্রসংসদের সর্বশেষ কাউন্সিলে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কারণে মাদরাসা ছাড়তে হয়। ফলে ওই দায়িত্বও বেশিদিন পালন করা সম্ভব হয়নি!

আট. সালেহ পদে মানোন্নয়নের জন্য তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ইফতিখারুল আলম মাসউদ ভাই নবাবপুরে প্রায় আধঘণ্টাব্যাপী সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছে সাক্ষাৎকার দিচ্ছি–বিষয়টি খুব ভাবিয়েছিল আমাকে। যদিও ভাই অত্যন্ত হাস্যোজ্জল ও সাবলীলভাবে কথা বলছিলেন তার পরও আমি বেশ ভয়ে ভয়ে কথা বলেছিলাম। মূলত, 'সালেহ' পদটি কী সেদিন কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। আরো বেশি আঁচ করেছিলাম যখন ৯৮, নাজিরাবাজারস্থ জমঈয়ত অফিসে শুব্বানের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমাদ ভাইকে 'সালেহ শপথ'-এর জন্য নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও সেদিন তাকে শপথ গ্রহণ করানো যায়নি। দায়িত্বশীলবৃন্দের কেউ কেউ বিষয়টি অন্যভাবে নিলেও সেদিন আমি বুঝেছিলাম, এটা কত বড় আমানত!

নয়. ফারুক আহমাদ ভাই ২০১১ সালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। আমারও সেই মেয়াদে ক্বারারের সদস্য হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় নাজিরাবাজারে নিয়মিত বৈঠকে যাওয়া হতো। ২০১৩ সালের পর অনেকটা যোগাযোগে ঘাটতি দেখা গিয়েছিল। ২০১৫ বা ২০১৬ সালের কোনো একসময় ভাই একদিন ফোনে সময় চেয়ে নিলেন। নির্ধারিত দিনে সাক্ষাতে বিজয়নগর পানির ট্যাঙ্কির গলির কাছে (ভাইয়ের তৎকালীন কর্মস্থলের পাশে) মারিয়া পেস্ট্রি শপে বসে তার সাথে দীর্ঘসময় কথা হয়েছিল। সেদিন ভাই সংগঠনে আরো সক্রিয় হওয়ার জন্য যে আবেদন পেশ করেছিলেন- সেটা আমি আজো ভুলতে পারি না। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, আমি সংগঠন বিমুখ হয়েছি। (যদিও বিষয় সেরকম ছিল না) কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, ভাই আমাকে আরো সক্রিয় করার জন্য সেদিন যেভাবে ব্যক্তিগত কন্টাক্ট করেছিলেন, আমি তো সেভাবে কাউকে কন্টাক্ট করতে পারলাম না! এর পর ভাইয়ের সাথে নরসিংদী জেলার এক প্রোগ্রামে অংশ নিতে সফরসঙ্গী হয়েছিলাম। পথে যেতে যেতে সেদিনও ভাই আমাকে ক্যারিয়ার বিষয়ে অনেক পরামর্শ দিয়েছিলেন।

দশ. শুব্বানের সর্বপ্রথম আহ্বায়ক অধ্যাপক মুনীরুল ইসলাম ও পরবর্তী আহ্বায়ক শাইখ গোলাম কিবরিয়া নূরী ভাইয়ের সাথে ২০১৭ সাল থেকে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়। তাদের সাথে তেমন কোনো স্মৃতি না থাকলেও তাদেরকে বেশ বিনয়ী ও প্রজ্ঞার অধিকারী মনে হয়েছে।

এগারো. শুব্বানের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। ২০০৪ সাল থেকে তাকে দেখার সুযোগ হয়। বিভিন্ন প্রশিক্ষণে তার বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রবণ করার সুযোগ হয়েছে। আমি এখনো তার কথা যতক্ষণ শুনি ক্লান্তিবোধ করি না। আল্লাহ তার কথায় এতো মধু দিয়েছেন যে,

কখনো তা শ্রোতার কাছে বিরক্তিকর মনে হয় না– যদিও তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা শোনা হয়। আর তার আরেকটি বড় গুণ হলো- তিনি কখনো হতাশ হন না। কেউ ভুল করলে তিরস্কার করেন তবে তা এতোটা নরমভাবে যে, সংশ্লিষ্টজন তা শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেন।

বারো. শুব্বানের অন্যতম সিপাহসালার শহীদ সাইদুর রহমান ভাইয়ের সাথে খুব বেশিদিন চলার সুযোগ পাইনি। ভাই ২০০৮ সালে শুব্বানের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের পর নিয়মিত বৈঠকে আসতেন। তখন তাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। সংগঠক ও তরুণ লেখক হিসেবে ভাই সবার প্রিয় ছিলেন। দায়িত্ব গ্রহণের কিছুদিন পরই তিনি শহীদ হন। তাকে যতটুকু দেখেছি একজন শান্তশিষ্ট ও ভদ্র মানুষ হিসেবে মনে হয়েছে। অহেতুক অনর্থক কোনো কথা তাকে বলতে শুনিনি। কারো সাথে কোন স্বার্থে বাদানুবাদ করার মতো মানুষ তাকে মনে হয়নি। কিন্তু ব্যক্তিগত কোন্ রেষের জেরে তাকে হত্যা করা হয়েছিল সেটা আজও প্রকাশ্যে আসেনি। মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের উচ্চ স্থানের অধিকারী করুন। আমীন।

তেরো. শুব্বানের দীর্ঘসময়ের কর্মী ও সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন ভাইকে অন্য সবার থেকে আলাদা মনে হয়। আগেও বলেছি- তিনি সংগঠনের পিছনে এতোটা সময় ব্যয় করেছেন, খেয়ে না খেয়ে অবিরত সারাদেশে সফর করেছেন, সংগঠন নিয়ে এতটা ভেবেছেন যে, নিজের উজ্জল ক্যারিয়ারের জন্য সময় দিতে ভুলে গেছেন। তার ত্যাগ ও নিবেদনটা এতোটা ফলপ্রসূ যে, তার উজ্জীবনী বক্তৃতাকে আগুনের ফুলকি মনে হয়। তাকে আমার জিহাদী অনুপ্রেরণার বাতিঘর মনে হয়। এই কাতারে আব্দুল্লাহ আল মোতি ভাইও রয়েছেন। নিভৃতচারী এই ভাই সংগঠনের বিপৎকালীন সময়ে সংগঠনকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। তাঁর কাছে আমরা ঋণী।

চৌদ্দ. আরো কয়েকজন দায়িত্বশীল ভাই খুব নিভৃতচারী ছিলেন; অথচ শুব্বানের জন্য নিবেদিত ছিলেন। সিরাজগঞ্জের আব্দুল আউয়াল ভাই, মেহেরপুরের মাহবুব ভাই, যশোরের তাওহীদুল ইসলাম ভাই, ঝিনাইদহের আব্দুর রহমান বাবলু ভাই, মেহেরপুরের আবুল বাশার ভাই এবং টাঙ্গাইলের আব্দুস সাত্তার ভাই। তারা জমঈয়ত ও শুব্বানের অফিসে বেশি সময় দিতেন। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যেকোনো আপ্যায়নের বড় আয়োজনে মাহবুব ভাই দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন। শুব্বানকে বড় অঙ্কের অনুদান দিতেন নিয়মিত। ভাইকে আমরা করোনাকালীন সময়ে হারিয়েছি। আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন। তাঁকে জান্নাতে উচ্চ স্থানে আসীন করুন। তাওহীদ ভাই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। বেশ পরিচ্ছন্ন মানুষ তিনি। দেখেই ভালো লাগতো। সাবেক কোষাধ্যক্ষ ড. মোঃ শরিফুল ইসলাম রিপন ভাইয়ের পর দীর্ঘসময় কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আব্দুর রহমান বাবলু ভাই। তিনি সাংবাদিকও বটে। ভাই আপন মানুষের মতো খোঁজ খবর নিতেন। আবুল বাশার ভাই একসময় শুব্বান কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির দায়িত্বে ছিলেন। আমরা বইপত্র তার কাছ থেকে সংগ্রহ করতাম। আব্দুস সাত্তার ভাই নবীনদের প্রতি খুব যত্নশীল ছিলেন। যেকোনো সমস্যায় কর্মীদের পাশে থাকার চেষ্টা করতেন। খেয়ে না খেয়ে এই ভাইয়েরা সেইসময় সংগঠনকে যথেষ্ট সময় ও শ্রম দিয়েছেন। তাঁদের শ্রমের

ওপর ভিত্তি করে শুব্বানকে আমরা আজকের অবস্থায় পেয়েছি। সংগঠনের নথিপত্র তাদের মাধ্যমে সংরক্ষিত ছিল। যদিও কেন্দ্রীয় শুব্বানের কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক চুরি হওয়ায় অনেক নথি নিখোঁজ হয়েছে। বিষয়টি খুব অস্বাভাবিক লেগেছিল আমার কাছে! সুম্মা আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ।

পনেরো. শুব্বানের অন্যতম সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী ভাই। ভাইকে এতোটাই আপন মনে হয় যে, তিনি যেন আমার সহোদর। নিরহংকারী শান্ত প্রকৃতির এক বিস্ময় নেতা তিনি! কর্মীদের সাথে এতোটা নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষাকারী নেতা আমি কম দেখেছি। ভাই যখন লন্ডনে থাকতেন, আমরা হয়তো ভাইয়ের কথা ভুলে গেছি কিন্তু ভাই ঠিকই নিয়মিতভাবে আমাদের সাথে কথা বলতেন শুব্বানের খোঁজখবর রাখতেন। এই গুণ অধ্যাপক মোহাম্মদ আসাদুল ইসলাম ভাইয়েরও রয়েছে। তিনিও সউদীআরবে অবস্থানকালে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ করতেন। সাংগঠনিক ও বিভিন্ন ইস্যুতে দীর্ঘসময় ধরে কথা বলতেন। যাই হোক, কাফী ভাইয়ের অন্যতম ভালো গুণ হলো– তিনি যেখানেই হোক যার সাথেই হোক সিটিংয়ে বসলে ডায়েরি মেইনটেন করতেন। তারিখসহ আলোচ্যবিষয় ও করণীয় লিখে ফেলতেন, যা একজন কর্মীর জন্য তো বটে; একজন আদর্শ নেতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সংগঠন বিষয়ে সাবেক দায়িত্বশীল ভাইদের অভিব্যক্তি: একদিন উপাধ্যক্ষ নুরুল আবসার ভাই বললেন, "আমি আজকের অবস্থানে আসার পেছনে সংগঠনের ভূমিকাই মুখ্য। আমার ব্যক্তিগত কোনো যোগ্যতা নেই।" এ ছাড়া সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও সৃষ্টি শিক্ষা পরিবারের চেয়ারম্যান ড. শরিফুল ইসলাম রিপন ভাই বিভিন্ন সময় বক্তৃতায় বলেছেন, "আমার আজকের এ অর্জন শুব্বানের কারণেই।" টাঙ্গাইল জেলায় প্রায় ৩০০টি শুব্বান শাখা তিনি একাই পরিচালনা করে নেতৃত্বের গুণাবলি যেমন অর্জন করেছেন তেমনি গড়ে তুলেছিলেন অসংখ্য নেতা-কর্মী, যারা আজ জমঈয়তের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছেন।

উপসংহার

একজন কর্মী সংগঠন কী– তা বুঝলে তার মাঝে সংগঠনের ভালোবাসা জন্মাতে বাধ্য। এজন্য সংগঠন বুঝার ক্ষেত্রে মনোযোগ বাড়াতে হবে। অনেক কর্মীই আছে যারা সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও কর্মপদ্ধতিই ঠিকমতো অধ্যয়ন করে না। অথচ তা একবার দু'বার পড়লে হয় না। বারবার নিয়মিত পড়তে হয়। যেকোনো বিষয়ের যত্ন করা হলে সেটা ফল দেয়। সংগঠনের যত্ন করা উচিৎ। তাহলে সেটা আমাদেরকে ফল দিবে। এই ফল সবসময় মুদ্রায় হিসাব করে হয় না। এর ফল অনেক সময় এমন রূপে হয়, যা সবাই উপলব্ধিও করতে পারে না। সংগঠনে যুক্ত হয়েই যদি কেউ প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাব করে কিংবা সংগঠনে দীর্ঘসময় দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, কিছু না পাওয়ার হতাশা ব্যক্ত করে, তা হলে বুঝতে হবে- তিনি ইখলাসের সাথে সংগঠন করেননি। বৈষয়িক কিছু পাওয়ার আশায় সংগঠন করা যাবে না; সংগঠনকে সর্বোচ্চ দেওয়ার উদার মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। তা হলে সংগঠন তাকে এমন কিছু দিবে, যা সে কখনো প্রত্যাশাও করেনি এবং এজন্য সে আজীবন সংগঠনের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। আসুন, সংগঠনের নিবেদিত কর্মী হই! নিবেদিত হই রবের ইবাদতে ও তাঁর সন্তুষ্টিতে!

মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও আল-কুরআন

ড. ইমতিয়াযুল আলম মাহফুয

ভূমিকা

আধুনিক বিজ্ঞানীগণ মহাবিশ্ব সৃষ্টির যে মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন তা Big Bang Theory তথা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। বিজ্ঞানীদের মধ্যে জ্যোতির্বিদ ল্যামেটার ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে এ তত্ত্বটি সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন।[১] একটি অসীম ঘনত্বের এবং উচ্চতাপমাত্রার অবস্থান থেকে মহাবিশ্বের সূচনা– এই ধারণাই বিগ ব্যাং তত্ত্বের মূল কথা। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মহাকাশের ছায়াপথগুলো ক্রমশ আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা মহাকাশে যে গ্রহ, ধূমকেতু, গ্রহাণু, নক্ষত্র দেখতে পাই এগুলো আগে এই জায়গায় ছিল না। বিজ্ঞানী এডউইন হাবল এর তত্ত্বমতে, গ্যালাক্সিগুলো আমাদের দিক থেকে সকল দিকে ছুটে চলেছে। হাবল প্রমাণ করতে পেরেছিলেন যে, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। অসীম ঘনত্বের এই মহাপরমাণুর ভিতরে বস্তুপুঞ্জের ঘন সন্নিবেশের ফলে এর তাপমাত্রা দাঁড়িয়েছিল- যে কোন পরিমাপ স্কেলের বিচারে ১০১৮ ডিগ্রি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীদের এ আবিষ্কারের সাথে এর বহু পূর্বে নাযিলকৃত কুরআনুল হাকীমের ভাষ্যের মিল রয়েছে। আর তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, কুরআন বিজ্ঞানের মূল উৎস। এ প্রবন্ধটিতে আল-কুরআনের আলোকে বিগ ব্যাং তত্ত্বের বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কুরআনের প্রথম বাণী ইকরা অর্থাৎ পড়। কেন পড়তে হবে তার কারণ আরো সুস্পষ্ট হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসে। যেমন তিনি বলেছেন- طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَىْ كُلِّ مُسْلِمٍ (জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয) ।[২] আর এই জ্ঞানের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদের বিশেষায়িত করেছেন, তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (যারা জ্ঞান রাখে আর যারা জ্ঞান রাখেনা তারা উভয় কি সমান?)।[৩] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে থেকে মুমিনদের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন) ।[৪] আর এই জ্ঞান হচ্ছে সেই জ্ঞান যার মাধ্যমে একজন ভাল-মন্দের পার্থক্য বুঝবে, কল্যাণ-অকল্যাণের পাথর্ক্য করতে পারবে। যে জ্ঞানের উৎস হবে কুরআন ও সুন্নাহ। পবিত্র কুরআন হচ্ছে জ্ঞানের মূল ও প্রধান উৎস। ইসলামী শরীআহর বিধি-বিধান ছাড়াও পার্থিব জীবনের উৎকর্ষ সাধনে

---

* সাবেক আম সদস্য, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ ও সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, বগুড়া।

১ Evans, J., & Friedlander, M. W. (2019, October 31). Galaxies and the expanding universe. Retrieved October 10, 2019, from https://www.britannica.com/science/astronomy/Galaxies-and-the-expanding-universe#ref1211557.

২ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনী, *সুনান ইবন মাজাহ* (মাকতাবাহ আশ-শামেলা, ১ম খন্ড, ২য় সংস্করণ), পৃ-২৬০।

৩ আল-কুরআন, সূরা যুমার : ৯ (৩৯ : ৯)।

৪ আল-কুরআন, সূরা মুজাদালাহ : ১১ (: ১১)।

আধুনিক বিজ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে কুরআন অনস্বীকার্য। পৃথিবীতে মানুষের প্রয়োজনে ও কল্যাণে আবিষ্কৃত সকল জ্ঞানের উৎস-ই আল-কুরআন। কুরআন গবেষকদের গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, এটি একটি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ যা বিজ্ঞানের অনেক উর্ধ্বে ঐশ্বী জ্ঞান ব্যতীত আর কিছু নয়।[৫] এর প্রমাণ– আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ যার মধ্যে অন্যতম বিগ ব্যাং তত্ত্ব।

বিজ্ঞানময় গ্রন্থ আল-কুরআন

আপাত দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের গ্রন্থ বলতে যা বুঝায়, আল-কুরআন তেমন কোন গ্রন্থ নয়। যার কারণে মানব রচিত গ্রন্থের ন্যায় এতে অধ্যায় ও বিষয় বিন্যাস করে কোন বৈজ্ঞানিক আলোচনা উপস্থাপন হয়নি।[৬] তবে এর অর্থ এই নয় যে, কুরআনে বিজ্ঞান সম্পর্কিত নির্দেশনায় কোন কমতি বা অসঙ্গতি রয়েছে বরং এর বর্ণনা পদ্ধতি ঐশ্বী গ্রন্থ হিসেবে এর স্বকীয়তার প্রমাণ জোরালো করেছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচনায় আল-কুরআন এমন তথ্য ও তত্ত্বের বর্ণনা করেছে, যা বিজ্ঞানীরা অনেক পরে আবিষ্কার করতে পেরেছে, আবার অনেক বিষয়ে বিজ্ঞানীগণ এখনও অনেক কিছুই কিংবা পুরোপুরি আত্মস্থ করতে সক্ষম হননি। আধুনিক বিজ্ঞানের সবগুলো শাখার নির্দেশনা রয়েছে এ গ্রন্থে। তাইতো কুরআনের মাধ্যমেই মানুষ জানতে পেরেছে লক্ষ বছর পূর্বের অজানা কাহিনী, এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টির রহস্য, চাঁদ, সূর্য, গ্রহ তারার অবস্থান ও এদের গতি-বিধির সূক্ষ্ম বিষয়াবলি। ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরের অজানা কাহিনীও কুরআনুল হাকীমের মাধ্যমেই মানুষ সর্বপ্রথম অবগত হয়। মানব থেকে শুরু করে পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকূলের জন্ম ধারা ও তার জীবন ধারার রহস্য একমাত্র কুরআনের মাধ্যমেই জানা সম্ভব হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলাও ঘোষণা করছেন- مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ (কুরআনে আমি কোন কিছুই বাদ দেইনি)।[৭] এককথায়, আধুনিক বিজ্ঞানের যত আবিষ্কার সব কিছুরই নির্দেশনা ও ইঙ্গিত কুরআনে বহু পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। কুরআনের এক একটি নির্দেশনা সেই নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রাখে।[৮] আর তাই গবেষকগণ অত্যন্ত যৌক্তিকভাবেই মেনে নিয়েছেন যে, বিজ্ঞানময় গ্রন্থ আল-কুরআন। আল্লাহ সুবাহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন- **تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ** (এগুলো প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবের আয়াত)।[৯] অনেকে এ আয়াতের 'হাকীম' শব্দের তাফসীর বিজ্ঞান বলে উল্লেখ করেছেন।

বিগ ব্যাং থিওরি

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন[১০] ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন যে, এই জগতের কোন কিছুই স্থির না। পৃথিবী, নক্ষত্র এমনকি পুরো সৌরজগত ঘুরছে। যেখানে কেবলমাত্র আলোর বেগ নির্দিষ্ট, বাকী সবই

---

৫ মুহাম্মদ আবু তালেব, *বিজ্ঞানময় কোরান* (ঢাকা : আরজু পাবলিকেশন্স, ২০০৮), পৃ.- ৯।

৬ ড. মো ঃ ইব্রাহিম খলিল, *আল-কুরআন ও হাদীসে বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা* (ঢাকা : আলোর ভূবন, ২০১৭), ভূমিকা।

৭ আল-কুরআন, সূরা আনআম : ৩৮ (৬ : ৩৮)।

৮ Research Board, *Scientific Indications in the Holy Quran* (Dhaka : Islamic Foundation Banglagdesh, 1990), P.-9

৯ আল-কুরআন, সূরা লুকমান : ২ (৩১ : ২)।

১০ আলবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein) একজন বিখ্যাত জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী। যার জন্ম মার্চ ১৪, ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ এবং মৃত্যু এপ্রিল ১৮, ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ।

আপেক্ষিক।[১১] পরবর্তীতে বিখ্যাত কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রচারণা করেন ম্যাক্স প্লাঙ্ক[১২], যার মাধ্যমে উন্মোচিত হয় আধুনিক পদার্থবিদ্যার নতুন জগত।[১৩] এরপর বাঙ্গালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোস[১৪] গবেষণা করেন ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণুর পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা শক্তি ও এর বিচ্ছুরণ নিয়ে। ভারতীয় বিজ্ঞানী হোমী জাহাঙ্গীর ভাভা[১৫] আবিষ্কার করেন বায়ুমণ্ডলে পরমাণুর সাথে বহির্বিশ্ব থেকে ধেয়ে আসা বস্তুকণার সাথে সংঘর্ষে উৎপাদিত বিদ্যুৎকণা, যা 'মেসন' নামে পরিচিত।[১৬] এভাবে মহাবিশ্বের নানান রহস্যভেদের পর সামনে আসে ছায়াপথ, নীহারিকা, নক্ষত্র তথা এ মহাবিশ্বের সৃষ্টির রহস্য। Big Bang বা মহা বিস্ফোরণ তত্ত্ব মতে, মহাবিশ্ব কোন ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি; বরং একটি বিশেষ মুহূর্তে মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়েছে। এই তত্ত্ব অনুসারে প্রায় ১৩ থেকে ২০ বিলিয়ন বছর পূর্বে একটি ঘন আর উত্তপ্ত অবস্থা থেকে মহাবিশ্বের উৎপত্তি অর্থাৎ সেই সময় একটি বিশাল বস্তুপিণ্ডের বিস্ফোরণের ফলে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল।[১৭] পরবর্তীতে জ্যোতির্বিদ ও মহাকাশ গবেষকদের আরো পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা দ্বারা এ তত্ত্বটি সমর্থিত ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৮] মহাবিশ্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত এই তত্ত্বকেই সত্য বলে বিবেচনা করা হয়।

জর্জ ল্যামেটার[১৯] নামে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে বলেন যে, মহাবিশ্ব একটি একক পয়েন্ট থেকে সৃষ্টি। মহাবিশ্ব বিশাল এবং এর বিস্তৃতি ঘটেই চলছে, যা একটি সুপ্রাচীন পরমাণু থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। তার প্রস্তাব অনুসারে মহাবিশ্বের জ্যামিতিক গঠন হবে গোলকাকার (Spherical), মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল থাকবে এবং এক সময় তা স্থির হবে (Hovering)।[২০] স্থিরকাল পার হয়ে আবার তা সম্প্রসারণশীল হবে। ল্যামেটারের মডেল অনুসারে মহাবিশ্ব অসীম ঘনত্বের (Infinite Densitz) একটি অবস্থা থেকে শুরু হয়। যাকে ল্যামেটার নাম দেন Primeval Atom বা আদি কণা। তিনি এই

---

১১ Redd, N. T. (2017, November 7). Einstein's Theory of General Relativity. Retrieved September 25, 2019, from https://www.space.com/17661-theory-general-relativity.html.

১২ ম্যাক্স কার্ল আর্নেস্ট লুডভিগ প্লাঙ্ক (Max Karl Ernst Ludwig Planck) এপ্রিল ২৩, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন।

১৩ (n.d.). Retrieved August 10, 2019, from https://www.spaceandmotion.com/quantum-theory-max-planck-quotes.htm.

১৪ সত্যেন্দ্রনাথ বসু (জানুয়ারী ১, ১৮৯৪ - ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ) বিশ্বখ্যাত বাঙালি পদার্থবিজ্ঞানী, কোয়ান্টাম স্ট্যাটিসটিক্সের উদ্ভাবক। তার গবেষণার ক্ষেত্র ছিল গাণিতিক পদার্থবিদ্যা।

১৫ হোমি জাহাঙ্গীর ভাভা (Homi Jehangir Bhabha) ভারতের একজন প্রসিদ্ধ নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞানী। যাকে ভারতের নিউক্লীয় প্রোগ্রামের জনক বলা হয়। এ পদার্থবিজ্ঞানীর জন্ম অক্টোবর ৩০, ১৯০৯ এবং মৃত্যু জানুয়ারি ২৪, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ। [সূত্র : Encyclopedia Britannica]

১৬ The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2016, October 25). Meson. Retrieved October 2, 2019, from https://www.britannica.com/science/meson.

১৭ ইঞ্জিনিয়ার শফি হায়দার সিদ্দিকি, আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও আল-কুরআন, মুফতি মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম মারুফ অনুদিত (ঢাকা : মাদানী কুতুবখানা, ২০১৬), পৃ.- ২৭।

১৮ ড. মো ঃ ইব্রাহিম খলিল, *আল-কুরআন ও হাদীসে বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা* (ঢাকা : আলোর ভূবন, ২০১৭), পৃ.-১০৪।

১৯ জর্জ ল্যামেটার (Georges Lemaître) একজন বিখ্যাত বেলজীয় বিশ্বতত্ত্ববিদ। বিজ্ঞানীর পাশাপাশি তিনি বেলজিয়ামের একজন রোমান ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারক পরিচিত ছিলেন। এ বিজ্ঞানীর জন্ম জুলাই ১৭, ১৮৯৪ এবং মৃত্যু জুন ২০, ১৯৬৬। [সূত্র : Encyclopedia Britannica]

২০ GEORGES LEMAÎTRE. (n.d.). Retrieved October 2, 2019, from https://www.physicsoftheuniverse.com/scientists_lemaitre.html.

ধারণাটি গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করেন। এই ধারণাই Big Bang Theory হিসেবে পরবর্তীতে প্রচার পায়। উল্লেখ্য যে, জর্জ ল্যামেটার এ তত্ত্ব প্রকাশ করলেও এই তত্ত্বকে বিস্তৃত করেন জর্জ গ্যামো।[২১] বিজ্ঞানী ল্যামেটারের মতে সৃষ্টির আদিতে মহাবিশ্বের সকল বস্তু আন্তঃআকর্ষণে পুঞ্জীভূত হয় এবং একটি বৃহৎ পরমাণুতে পরিণত হয়। এই পরমাণুটি পরে বিস্ফোরিত হয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়। এই মতবাদকে সমর্থন ও ব্যাখ্যা করেন বিজ্ঞানী এডুইন হাবল[২২]। যার পর্যবেক্ষণ গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, মহাকাশের গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে ক্রমান্বয়ে নির্দিষ্ট গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে।[২৩] তাঁর মতে, আদিতে মহাবিস্ফোরণের ফলে গ্যালাক্সিগুলো সৃষ্টি হয়েছিল এবং এগুলোর দূরে সরে যাওয়ার আচরণ বিগ-ব্যাংকেই সমর্থন করে। মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রধানত যে দু'টি বিষয় সুস্পষ্ট তা হল-

১. এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে।
২. সৃষ্টির পর হতে এই মহাবিশ্ব ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়েই চলেছে।

বিগ ব্যাং থিওরি ও আল-কুরআন

মহাকাশ বিজ্ঞানীগণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহাবিশ্বের সূচনা সম্পর্কে উপরিউক্ত ধারণায় উপনীত হলেও এর বহু বছর আগে প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বে কুরআন এ সম্পর্কে ইরশাদ করেছে। যেমন-

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

"অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ করে দেখে না, নভোমণ্ডল এবং ভূ-মণ্ডল (একটি বস্তুর মতো) পরস্পর সংযুক্ত ছিল; অত:পর আমি এদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি।"[২৪]

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

"প্রবল ক্ষমতা বলে আমি আকাশ সৃষ্টি করেছি এবং অবশ্যই তা সম্প্রসারণ করে চলেছি।"[২৫]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন-

وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে যেমন ইচ্ছা বর্ধিত করেন এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।"[২৬]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহের বক্তব্যের সাথে আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত বিগ ব্যাং থিওরির কোন বিরোধ নেই; বরং কুরআনের নির্দেশনার বিস্তারিত ব্যাখ্যাই যেন এ তত্ত্বটি।

---

২১ জর্জ গ্যামো (George Gamow) একজন ইউক্রেনীয় পদার্থবিজ্ঞানী এবং বিশ্বতত্ত্ববিদ। তার প্রকৃত নাম গ্রেগরি আন্তোনভিচ গ্যামফ (Georgiy Antonovich Gamov)| কোয়ান্টাম টানেলিং আবিষ্কারের জন্য তিনি বিখ্যাত।

২২ মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুইন হাবল (Edwin Hubble) ছায়াপথ, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ এবং মহাবিশ্বের আকার-আকৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করে খ্যাতি লাভ করেন।

২৩ মুহাম্মদ আবু তালেব, *বিজ্ঞানময় কোরান* (ঢাকা : আরজু পাবলিকেশন্স, ২০০৮), পৃ.- ৫৬।

২৪ আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া : ৩০ (২১ : ৩০)।

২৫ আল-কুরআন, সূরা যারিয়াত : ৪৭ (৫১ : ৪৭)।

২৬ আল-কুরআন, সূরা ফাতির : ১ (৩৫ : ১)।

পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য আবিষ্কার করলেও এর সাথে যথেষ্ট সংশ্লিষ্ট কিছু ছোট-খাট প্রশ্নের যথাযথ উত্তর বিজ্ঞানীরা দিতে পারেননি। যেমন, কী কারণে সেই আদি বিস্ফোরণ ঘটেছিল কিংবা এ বিস্ফোরিত বস্তুটি কোথা থেকে এলো? বিজ্ঞানীদের মতে, আদিতে মহাকাশের বস্তুপুঞ্জ বিক্ষিপ্তাকারে ছড়ানো ছিল। বিগ ব্যাং তত্ত্বানুসারে এই সকল বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো আন্তঃআকর্ষণের কারণে পরস্পরের কাছে আসতে থাকে এবং ধীরে ধীরে একটি ডিমের আকার ধারণ করে, যা মহাপরমাণু নামে (Supper Atom) আখ্যায়িত। তবে বিজ্ঞানীরা বিক্ষিপ্ত বস্তুপুঞ্জ কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল এবং এগুলোর বিন্যাস কীরূপ ছিল, তার ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। অর্থাৎ এ ব্যাপারে কোন যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানীগণ উপনীত হতে পারেননি। তবে বিজ্ঞানীরা একক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারলেও তাদের গবেষণা চালিয়ে গেছেন সেই বিন্দুর আগে কি-ই বা থাকতে পারে? এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে। আর এখানে থেকেই উৎপত্তি "কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের"। এ ধারণা অনুযায়ী কোনো কিছু সৃষ্টি হতে পারে শুন্য থেকেই। আর তাই বিজ্ঞানীদের মতে, শুন্য থেকেই সেই একক পয়েন্টের উদ্ভব যার বিস্ফোরণের মাধ্যমেই এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম মত ব্যক্ত করেন বিজ্ঞানী লরেন্স ক্রাউস। যা তিনি তার বই A Universe From Nothing এ উল্লেখ করেছেন।[২৭] পরবর্তীতে স্টিফেন হকিংস তার The Grand Design গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এক লেকচারে হকিং লেখেন, 'বিগ ব্যাং এর আগে আসলে কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়। কেননা, এমন কোনো উপায় নেই, যার মাধ্যমে সে সময় কী ঘটেছিল তা জানা সম্ভব। সুতরাং, যেহেতু বিগ ব্যাং এর আগে ঠিক কী ঘটেছিল তা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা সম্ভব নয় এবং বিষয়টি সম্পর্কে শুধু তত্ত্ব দিয়েই বুঝা সম্ভব বা ধারণা অর্জন সম্ভব সেহেতু কেউ চাইলে বিষয়টিতে এই তত্ত্বের বাইরে গিয়েও মন্তব্য করতে পারেন। অর্থাৎ বিজ্ঞান এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কোন কিছু বলতে পারেনি। অথচ পবিত্র কুরআন এ বিষয়ে অনেক আগেই বলে দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُون

"তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, 'হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।"[২৮]

কুরআনুল কারীমের অন্যত্র বলা হয়েছে-

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ

"তিনিই সঠিকভাবে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। যেদিন তিনি বলবেন- হয়ে যাও, তখন তা হয়ে যাবে। তাঁর কথা সত্য।"[২৯]

বিগ ব্যাং পরবর্তী মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণের শেষ কোথায়? এ ব্যাপারেও বিজ্ঞানীগণ কোন একক সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। তবে তারা এটি জানিয়েছেন যে, সময়ের যতই পেছনে যাওয়া যাবে মহাবিশ্ব ক্রমেই সংকুচিত হতে হতে একটি বিন্দুতে এসে থামবে, ঠিক যে বিন্দু থেকে শুরু। অর্থাৎ মহাবিস্ফোরণ

---

২৭ krauss, lawrence M. (2012). *A Universe From Nothing*. New York: FREE PRESS, P-108.

২৮ আল-কুরআন, সূরা বাকারাহ : ১১৭ (২ : ১১৭)।

২৯ আল-কুরআন, সূরা আনআম : ৭৩ (৬ : ৭৩)।

পরবর্তী মহাবিশ্বের যে বিস্তার ঘটে চলেছে তা নির্দিষ্ট একটি সময়ে আবার গুটিয়ে আগের পর্যায়ে চলে আসবে, গুটানো বইপত্রের মতো মহাবিশ্ব একদিন গুটিয়ে যাবে। যার মাধ্যমেই এই মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে পড়বে। বিজ্ঞানী ফ্রীম্যান জন ডাইসন[৩০] এটি প্রমাণ করতে যেয়ে বলেন, মহাবিশ্ব সংকুচিত হয়ে একটি বিন্দুতে এসে Big Crunch ঘটাবে। যার প্রায় ১ মিলিয়ন বছর পূর্বেই গ্যালাক্সিসমূহের মধ্যে ফাঁকা জায়গা গুটিয়ে আসবে। এর ফলে নক্ষত্রসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যাবে। ফলে অসংখ্য Black hole (কৃষ্ণবিহ্বর) সৃষ্টি হবে। অবশেষে এসব Black hole একে অপরকে আকৃষ্ট করে একাকার হয়ে যাবে এবং সেগুলো একটি অতি উষ্ণ, অসীম ঘনত্বের বস্তুপিণ্ড তৈরী করবে। মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসার ওয়েব সাইটে ব্লাক হোলের পরিচয়ে বলা হয়েছে-

Black holes are not really holes at all. They are the opposite of empty! Black holes have the most matter stuffed into the least space of any objects in the universe. Because they are so compact, they have very strong gravity.[31]

বিজ্ঞানীরা নিকট অতীতে এ ব্যাপারে জানতে পারলেও পবিত্র কুরআনে অনেক আগেই এটি বলা দেয়া হয়েছে। যেমন-

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

"সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে।"[৩২]

এ ব্যাপারে আরো ইরশাদ হচ্ছে-

إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ - وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ

"সেদিন আকাশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং গ্রহসমূহ ছড়িয়ে পড়বে।"[৩৩]

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا

"সেদিন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গুড়া হয়ে যাবে।"[৩৪]

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ

"এটা হবে এক মহাবিস্ফোরণ, আর তারা সবাই আমার সমীপে সমবেত হবে।"[৩৫]

উপসংহার

প্রায় সাড়ে পনেরোশত বছর পূর্বে অবতীর্ণ নির্ভুল ঐশ্বী গ্রন্থ আল-কুরআন। যেখানে আধুনিক বিজ্ঞানের বয়স দুইশত বছরের অধিক নয়। তবে কুরআন আধুনিক বিজ্ঞানকে কখনোই অস্বীকার করে না। কেননা বিজ্ঞানের সঠিক গবেষণা ও আবিষ্কার কুরআন অনুধাবনে সহায়ক। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে বিগ ব্যাং তত্ত্ব। বিজ্ঞানের এ আবিষ্কার কুরআনের নির্দেশনার সাথে শুধু মিলেই যাইনি; বরং বিজ্ঞান যেখানে ব্যর্থ

---

৩০ ফ্রীম্যান জন ডাইসন, (Freeman John Dzson) একজন ব্রিটিশ-আমেরিকান তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতবিদ।

৩১ Black Hole Rescue! (2013, December 20). Retrieved October 9, 2019, from https://spaceplace.nasa.gov/black-hole-rescue/en/.

৩২ আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া : ১০৪ (২১:১০৪)।

৩৩ আল-কুরআন, সূরা আল-ইনফিতার : ১ (৮২ : ১)।

৩৪ আল-কুরআন, সূরা আল-ফজর : ২১ (৮৯:২১)।

৩৫ আল-কুরআন, সূরা ইয়াসিন : ৫৩ (৩৬ :৫৩)।

নিরূপায় হয়ে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন তত্ত্বের উদ্ভব ঘটিয়েছে কুরআন তারও সমাধান দিয়েছে অনেক পূর্বেই। এমনিভাবে কুরআনে রয়েছে জীবন ও জগতের অজানা অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ সমাধান, যা সর্বকালেই অকাট্য ও নির্ভুল প্রমাণিত হবে। আর তাই বিজ্ঞান এবং কুরআনের মাঝে কোন দ্বন্দ্ব ও সংঘাত কখনোই খুঁজে পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, তবে যদি কেউ প্রকৃত জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির অভাবে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারেন তবে সেটা তার ব্যর্থতা। তাই বিজ্ঞান যতক্ষণ কুরআনের সাথে না মিলবে কিংবা কুরআনের জ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক হবে ততক্ষণ নিশ্চিন্তে বলা যাবে না যে, ঐ বিজ্ঞান শতভাগ শুদ্ধ। কারণ, বিজ্ঞান সত্যের অনুসন্ধান করে, সত্যের মানদণ্ড নির্ধারণ করে না, বিজ্ঞানের রূপ এটাই। ইতঃপূর্বে অনেক সময়ই দেখা গেছে যে, বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী বিজ্ঞানীগণ আগের গবেষণাকে ভুল প্রমাণিত করেছেন। যেমন "সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে" এ কথা যখন এরিস্টোটল[৩৬] (Aristotle) প্রচার করলেন তখন তা নিয়ে কোন লোক আপত্তি করেনি, কারণ চোখে দেখায় এটাই সত্য বলে মনে হয়।[৩৭] কিন্তু বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস[৩৮] (Nicolaus Copernicus) যখন বললেন, "পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে"[৩৯] তখন ঘোর আপত্তি শুরু হলো। কারণ একথা সহজাত প্রবণতার বিরুদ্ধে। কিন্তু যখন গ্যালিলিও গ্যালিলাই[৪০] (Galileo Galilei) এর স্বপক্ষে যুক্তি দিলেন তখন মানুষ দেরিতে হলেও সত্যকে মেনে নিতে বাধ্য হলো। একজন বিজ্ঞানী তার সময়ে তথ্য-উপাত্ত, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন সেটাই তখন বিজ্ঞান ও সত্য বলে সবাই মানে। পরবর্তী বিজ্ঞানীদের গবেষণায় হয় তা আরো জোরালো হয় কিংবা পুরোপুরি ভুল প্রমাণিত হয়। আর তাই যে জিনিস পরিবর্তনশীল তা থেকে বিশুদ্ধ জ্ঞান আহরণ সম্ভব নয়। কাজেই বিজ্ঞান যখন কুরআনের সাথে মিলবে তখন বিজ্ঞান সঠিক বলে বিবেচিত হবে। যেমন, পৃথিবী না সূর্য কে ঘুরছে, বহুযুগ বিতর্ক থাকলেও অনেক আগেই কুরআন বলেছে-

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

(সূর্যের জন্য সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া, আর রাতের জন্য সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা, আর প্রত্যেকেই কক্ষ পথে ভেসে বেড়ায়)।[৪১]

আর তাই মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ ও শান্তি কুরআনের নির্দেশিত বিজ্ঞান চর্চার মধ্যেই নিহিত এবং এ কথা অনস্বীকার্য যে, "ইসলাম একটি বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম"। অধিকন্তু, এই কুরআনে রয়েছে এমন অনেক বিষয় যা আজও বিজ্ঞানে অনাবিষ্কৃত।

---

৩৬ এরিস্টটল (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪ - ৩২২) হলেন বিশ্ববিখ্যাত গ্রিক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। যাকে প্রাণীবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। এছাড়া তাকে "পশ্চিমা দর্শনের জনক" বলে অভিহিত করা হয়। [সূত্র : Encyclopedia Britannica]

৩৭ ইঞ্জিনিয়ার শফি হায়দার সিদ্দিকি, আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও আল-কুরআন, মুফতি মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম মারূফ অনূদিত (ঢাকা : মাদানী কুতুবখানা, ২০১৬), পৃ.- ৫।

৩৮ নিকোলাউস কোপের্নিকুস (Nicolaus Copernicus) একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

৩৯ ডা. জাকির নায়েক, *ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১*, ডাঃ হুমায়ুন কবীর, গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, মাওঃ শহীদুল ইসলাম ফারুকী ও নূর মোহাম্মদ মল্লিক সম্পাদিত (ঢাকা : ডা. জাকির নায়েক পাবলিকেশন্স, ২০১০), পৃ.- ১৭।

৪০ গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৫৬৪ - ৮ জানুয়ারি, ১৬৪২) একজন ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক।

৪১ আল-কুরআন, সূরা ইয়াসিন : ৪০ (৩৬ :৪০)।

জীবনগতির স্বর্ণবাণী ও দর্শন

তাওহীদ বিন হেলাল*১

মানুষ যখন প্রভু ভোলা হয়ে সরল সঠিক পথ থেকে যোজন যোজন দূরে চলে যায় তখন মহান আল্লাহ্ এমন কিছু মহাপুরুষ পাঠান যাদেরকে তিনি নিজ রহমতের চাদরে আবৃত রাখেন এবং যাদের মোহনীয় ব্যক্তিত্বে হাজার হাজার পথ ভোলা মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পায়। পূর্বযুগে তাঁরা রাসূল বা নবীর মর্যাদায় উনীত হয়েছিল আর শেষ নবী (সাঃ)-এর পরের যুগে এই ব্যক্তিরা হলেন তাঁর যোগ্য ওয়ারিস। তেমনি আদর্শবান দু'জন ব্যক্তিত্ব আমাদের প্রাণপুরুষ আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ. (১৯০০-১৯৬০ খৃ.) ও তার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী রহ. (১৯৩০-২০০৩ খৃ.)। তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত ও তাঁদের অমূল্য উক্তি দিয়ে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি সাজানো হয়েছে।

এক নজরে আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ.

- তিনি ১৯০০ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বর্ধমান জেলার টুবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস ছিল দিনাজপুর জেলার বস্তিয়াড়া গ্রামে। তার বাবার নাম সৈয়দ আবদুল হাদী রহ. এবং মাতার নাম উম্মু সালমা।[২]
- তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় এংলো-পারসিয়ান বিভাগ হতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেন্ট জেভিয়ারস কলেজে বি.এ. ক্লাসে অধ্যয়নের সময় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা বর্জন করে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন।[৩]
- স্কুলে পড়ার সময়েই স্টেটম্যান (The Statesman) এর ইংরেজ পরিচালিত ও সম্পাদিত উঁচু স্ট্যান্ডার্ডের পত্রিকায় তাঁর লেখা বের হতো।[৪]
- স্কুলে পাঠরত অবস্থায় তিনি কলকাতায় মওলানা আবুল কালাম আযাদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হয়ে তাঁর নিকট যাতায়াত করতে থাকেন। তিনি আবুল কালাম আযাদের রঙে এমন ভাবে রঙিত হয়েছিলেন যে, তাঁকে বাংলার দ্বিতীয় আবুল কালাম আযাদ বলা হয়।[৫]
- ১৯৪৬ সালে হারাগাছ বন্দরে নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহলে হাদীস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনফারেন্সে "নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস" গঠিত হয় এবং তিনি তার সভাপতি নির্বাচিত হন।[৬]

---

*১ সদস্য, মাজলিসে আম, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ; যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস কুমিল্লা জেলা।
২. উইকিপিডিয়া বাংলা
৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, ৬২ পৃষ্ঠা
৪. আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য, মুহাম্মদ আবদুর রহমান বি.এ.বি.টি
৫. প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত

- ১৯৪৯ সালে তাঁর চেষ্টায় জমঈয়তের পক্ষ হতে "আল-হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ" নামে মুদ্রাণালয় ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং এই সালেই জমঈয়তের মুখপাত্ররূপে তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় "মাসিক তরজুমানুল হাদীস" আত্মপ্রকাশ করে।[৭]
- ১৯৫৭ সালের ৭ অক্টোবর তাঁর সম্পাদনায় "সাপ্তাহিক আরাফাত" প্রকাশিত হয়।[৮]
- আরবী, উর্দু, পারসী এবং ইংরেজি হতে বাংলায় ভাষান্তরিত করার কাজে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। তিনি আরবী, উর্দু, ইংরেজি ও বাংলায় অসংখ্য পুস্তক রচনা করেন।[৯]
- তাঁর জীবনব্যাপী ধর্মীয় সাহিত্য সাধনা ও গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৯ (বাংলা একাডেমির ওয়েবসাইট অনুসারে ১৯৬০) সালে বাংলা একাডেমী তাঁকে সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে।[১০]
- উম্মাহ দরদী **আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ ১৯৬০ সালের ৪ জুন পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।**

তাঁর কিছু স্বর্ণখোচিত উক্তি

- ভ্রাতৃগণ, সমাজের এই দুরাবস্থা ও লজ্জাকর পরিস্থিতির দুইটি কারণ আমি নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছি। প্রধান ও প্রথম কারণঃ Inferiority Complex- সৎসাহস এর অভাব ও মানসিক দুর্বলতার প্রভাব। আর একটি কারণ এই যে, অজ্ঞতার তুল্য শত্রু আর কিছুই নাই (পড়াশুনা না করা)। আহলে হাদীস পরিচিতি, পৃষ্ঠাঃ ২,৩।
- ইসলাম আহলে-হাদীস মতবাদের নামান্তর মাত্র ছিল বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে তখন আহলে-হাদীসরূপে অভিহিত হইবার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। (আহলে হাদীস পরিচিতি, পৃষ্ঠাঃ ৮)
- আহলে-হাদীসগণ কোন নূতন দল নহে বা শায়খ মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (১১১৫-১২০৬ হি.) অথবা অন্য কোন আধুনিক ব্যক্তি এই দলের প্রতিষ্ঠাতা নহেন। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং হযরত রসূল করীম মোহাম্মদ মুস্তফা সাঃ। (আহলে হাদীস পরিচিতি, পৃষ্ঠাঃ ১৩)
- মুসলমানদিগকে সর্বপ্রকার শাস্ত্রীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কুরআন ও রাসূলুল্লাহর সা. হাদীস অনুসারে করিতে হইবে। (আহলে হাদীস পরিচিতি, পৃষ্ঠাঃ ১৪)
- শুধু জাতীয়তা (Nationality), দেশ বা বর্ণগত বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রে যদি মুসলমানগণ একত্রিত হইতে চাহে, তাহা হইলে তাহাদের এই প্রেরণার নাম কোরআনের ভাষায় হইবে حمية الجاهلية অন্ধ যুগের গোঁড়ামী এবং তাহাদের Slogan বা ধ্বনি রসূলুল্লাহর সা.-এর ভাষায় হইবে دعوة الجاهلية অন্ধ যুগের Slogan। (আহলে হাদীস পরিচিতি, পৃষ্ঠাঃ ১৭)

---

৭. প্রাগুক্ত
৮. প্রাগুক্ত
৯. প্রাগুক্ত
১০. প্রাগুক্ত

- ❖ মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর স্বীকারোক্তি ব্যতীত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অঙ্গীকার যেরূপ অর্থহীন রাসূলুল্লাহর সা. সঠিক ও প্রমাণিত হাদীসকে বাদ দিয়া কোরআনকে মান্য করার দাবীও সেইরূপ নিরর্থক। (আহলে হাদীস পরিচিতি, পৃষ্ঠা: ১৯)
- ❖ বিভিন্ন কারণে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে (Private Affairs) পরিণত হইয়াছে; পার্থিব জীবনের সহিত ধর্মের কোন সংশ্রব তাহারা স্বীকার করেন না। (আহলে হাদীস পরিচিতি, পৃষ্ঠা: ২১)
- ❖ আজ মুসলমানগণ যে ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছেন তাঁহাদের নৈতিক, চারিত্রিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় আকাশ যেরূপ তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সকল দুর্গতি ও সর্বনাশের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে কায়মনোবাক্যে আহলে-হাদীস আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। (আহলে হাদীস পরিচিতি, পৃষ্ঠা: ৪৩)
- ❖ মোটের উপর শতাব্দীর উর্ধকাল ধরিয়া পাক-ভারতের যে কোন স্থানে যে কোন ধর্মীয় রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, তমদ্দুনিক ও সংস্কারমূলক আন্দোলন জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতে আহলে হাদীসগণ হয় কর্ণধার ও পথপ্রদর্শকরূপে নেতৃত্ব করিয়াছেন আর না হয় কোরআনের বিশ্ববিশ্রুত নীতি 'ন্যায়ের সাহচর্য ও অন্যায়ের প্রতিরোধ'- অনুসারে আহলে হাদীসগণ সেগুলির সহিত সহযোগের হস্ত মিলাইয়া আসিয়াছেন। (আহলে হাদীস পরিচিতি, পৃষ্ঠা: ১৬০)
- ❖ এরিষ্ট্রোটল যেরূপ ন্যায় শাস্ত্রের আবিষ্কর্তারূপে আর খলীল বিন আহমদ যেরূপ কাব্য আবিষ্কারকরূপে অমর হইয়া রহিয়াছেন, ইমাম শাফেয়ীও তদ্রুপ অসূলে ফিকহের আবিষ্কারকরূপে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন, তাঁহার পূর্বে ফিকহ শাস্ত্রের কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিলনা। (ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি, পৃষ্ঠা: ১২৬)
- ❖ প্রবৃত্তির তাড়না অনুসারে মানুষ চলিতে থাকিলে উহার পরিণতিস্বরূপ খুদীর প্রভুত্ব অবলুপ্ত ও প্রবৃত্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে। (সিয়ামে রমাযান, পৃষ্ঠা: ২২)
- ❖ বন্ধুগণ! আহলে হাদীস আন্দোলন নাস্তিক্য ও জড়বাদ, বহু ঈশ্বরবাদ ও বিদআতের বর্তমান ঘূর্ণিবার্তার ভিতর তাওহীদ ও সুন্নাহর মশাল সমুজ্জল রাখতে চায় আর সমুদয় মুসলিমের জাতিভেদ, ফির্কাপরস্তী ও দলীয় কোন্দল পরিহার করে তাতে বিস্মৃত অগ্নিমন্ত্রে পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করার উদাত্ত আহ্বান জানায়। (ঈদে কুরবান, পৃষ্ঠা: ৪২)

এক নজরে আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী রহ.

- ➢ ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী ১৯৩০ সালের ১ সেপ্টেম্বর বগুড়া শহরের অদূরে শিবগঞ্জ থানার সৈয়দপুর তাঁর নানা বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন।
- ➢ ১৯৪৬ সালে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজ থেকে সমগ্র বাংলায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি আই এ পাশ করেন ।
- ➢ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ থেকে ১৯৪৯ সালে অনার্স এবং ১৯৫০ সালে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। উভয় পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

- অনার্সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনার্স ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য নীলকান্ত মেমোরিয়াল স্বর্ণপদক এবং এম. এ. তে রেকর্ড নম্বর পেয়ে বাহরুল উলুম সোহরাওয়ার্দী স্বর্ণপদকে ভূষিত হন।
- উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন এবং মাত্র দু'বছর সময়েই সেখান থেকে ডি ফিল ডিগ্রী লাভ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সুপার ভাইজার ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত দুই প্রাচ্যবিদ প্রফেসর এইচ.এ.আর গীব এবং যোসেফ শাখত।
- তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "উপমহাদেশের সংস্কার ও জিহাদ আন্দোলন এবং আরব দেশের ওয়াহাবী আন্দোলন : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ"।
- বিলেত থেকে ফিরে এসে ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সার্ভিসে সরাসরি অধ্যাপক পদে নিযুক্তি লাভ করে প্রায় এক বছর ঢাকা কলেজে এবং কয়েক মাস রাজশাহী কলেজে আরবী বিষয়ে অধ্যাপনা করেন।
- ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে ড.এম.এ বারী রাজশাহী বিশ্বদ্যালয়ের রীডার পদে যোগদান করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও কৃষ্টি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক পদে যথা- প্রফেসর, ডীন ইত্যাদি পদ অলংকৃত করে ১৯৭১ সালে মাত্র ৪১ বছর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। (কমবয়সী ভাইসচ্যান্সেলর হিসেবে তখন এটি রেকর্ড ছিল।)
- ১৯৮১ সালের শুরুতে তিনি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং দুই মেয়াদে আট বছর অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে সে পদের দায়িত্ব পালন করেন।
- তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে তিনিই প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের একটি সেরা কীর্তী।
- ১৭টিরও অধিক দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ২৩টির অধিক দেশের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি/সদস্যের দায়িত্ব পালন করেন ।
- ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী ইসলামী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ছোটদের ইসলামী বিশ্বকোষ-এর চেয়ারম্যান এবং একসময় ইসলামী ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- ১৯৬০ সালে বাংলাদেশ জমঈয়ত আহলে হাদীসের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা, বিরল ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ পাণ্ডিত্ব ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে ৪৩ বছরে টেকনাফ হতে তেঁতুলিয়া এবং সুন্দরবন হতে জয়েন্তিয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ৩৫টি সাংগঠনিক জেলা, সাড়ে পাঁচশত ইলাকা, এবং ছয় সহস্রাধিক শাখা জমঈয়ত গঠনের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন আহলে হাদীস জামাআতকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করেছেন।

- ➢ জমঈয়তের ৬ষ্ঠ কেন্দ্রীয় কনফারেন্সে তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যোগদান করেছিলেন, বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আব্দুর রহমান বিশ্বাস, আল-হারামাইন আশ-শরীফাইন-এর মাননীয় চেয়ারম্যান এবং পবিত্র কা'বা শরীফের ইমাম শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আস্ সুবাইল, কুয়েতের প্রতিনিধি ড. সামী আন নাসের প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।
- ➢ উত্তর যাত্রাবাড়িতে জমঈয়তের জন্য ২৬ কাঠা জমি এবং আন্তর্জাতিক মানের একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য রাজধানীর অদূরে সাভার থানার বাইপাইলে ক্রয় করেছেন প্রায় ৫০ বিঘা সম্পত্তি।
- ➢ প্রফেসর আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী ২০০৩ সালের ৪ জুন বুধবার সোবহে সাদিকের পূর্বে ফানি দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে তিনি পরম প্রিয় আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।[১১]

তাঁর কিছু অসাধারণ উক্তি

- ❖ 'আহলে হাদীসের' পরিচয় সম্পর্কে সর্বপ্রথম ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, 'আহলে হাদীস' কোন মাযহব বা ফির্কার নাম নয়। (ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি, পৃষ্ঠাঃ ৫)
- ❖ যে হাদীসের উপরে সাহাবা ও ফকীহগণ আমল করিয়া থাকুন অথবা না করিয়া থাকুন, সকল অবস্থায় আহলে- হাদীসগণের নিকট রসূলুল্লাহ (সঃ) এর বিশুদ্ধ হাদীস অগ্রগণ্য ও প্রতিপালনীয় হইয়া থাকে। (ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি, পৃষ্ঠাঃ ১২)
- ❖ বর্তমানের ইউরোপীয় সভ্যতার উপরে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার প্রভাব ইতিহাসবিশ্রুত ও সর্বজনবিদিত। গ্রীক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে মানুষ আর দেবতার পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বন্দ্ব ও সক্রিয় বিরোধিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। (ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি, পৃষ্ঠাঃ ১৬)
- ❖ আহলে হাদীস আন্দোলন নতুন কোন আন্দোলন নয়, এ আন্দোলন হুজুর সা.-এর পর থেকেই চলে আসছে। (অভিভাষণ, পৃষ্ঠাঃ ৩০)
- ❖ এ কথা কাউকে বলে দিতে হবে না যে, উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কোন ইমাম, দরবেশ অথবা কুটনীতি বিশারদকে আশ্রয় ও কেন্দ্র করে আহলে হাদীস আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়নি। (অভিভাষণ, পৃষ্ঠাঃ ৩১)
- ❖ আজকের দিনে আমাদের সবচেয়ে বড় ক্রাইসিস হচ্ছে- আইডেন্টিটির ক্রাইসিস। আমরা আমাদের আত্মপরিচয়ের সঙ্কটে বিব্রত! আমরা কী, কোত্থেকে এসেছি, আমাদের মূল উৎস কোথায়? (অভিভাষণ, পৃষ্ঠাঃ ৪৯)
- ❖ অধুনা সুবিধাবাদ অর্থে Pragmatism শব্দের বহুল ব্যবহার চলছে। আমরা কি অসুবিধাবাদী ভূমিকায় নিজেদের নিয়োজিত রাখব, না আমাদের ন্যায় অন্যায় বোধ থাকবে। (অভিভাষণ, পৃষ্ঠাঃ ৫১)
- ❖ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যার দ্বারা আমাদের ছেলেরা প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, তারা আল্লাহ সম্পর্কে, আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে, হালাল হারাম সম্পর্কে,

১১. অভিভাষণ, পৃষ্ঠা: ১৭-২২

ন্যায় আন্যায় সম্পর্কে, পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে, মানবতা সম্পর্কে, কীভাবে বড়কে সম্মান করতে হবে, কীভাবে ছোটদের সাথে ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে সম্মক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। (অভিভাষণ, পৃষ্ঠা: ৬৪)

❖ এটা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে আমরা অধিকাংশ মানুষ বাস করছি কিন্তু আমরা কর্মবীর না হয়ে বাক্যবীর হয়ে উঠেছি। (অভিভাষণ, পৃষ্ঠা: ১২৮)

❖ নিয়মিত কর্মী ছাড়া কোন আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। আজকে জাতির ও দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনাকে আমাকে বিশেষভাবে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। শুধু এখানে ওখানে দু'একটা সভা সমিতি করে আর কতকগুলো প্রস্তাব পাশ করে কিন্তু সমস্যার সমাধান হতে পারে না। (অভিভাষণ, পৃষ্ঠা: ১২৮)

❖ যারা আল্লাহকে ভয় করে না তারা মানুষকেও ভয় করে না। আর যারা আখেরাতকে ভয় করে না তাদের চেয়ে বড় হটকারী আর কেউ নেই। (অভিভাষণ, পৃষ্ঠা: ১৮০)

❖ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথেই কেবল শান্তি আসতে পারে। (অভিভাষণ, পৃষ্ঠা: ৩৩৭)

বাংলার জমীনে আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূল সা.-এর আদর্শ অনুসরণ, অনুকরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের সর্বক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ. এবং আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী রহ.-এর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। দ্বীনের পথে গোটা জীবন উৎসর্গকারী আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী রহ.-এর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে এবং সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে তাঁর বক্তব্যের সংখ্যাও প্রায় কয়েক শতাধিক। অধিকন্তু, আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী রহ.-এর মূল্যবান বইয়ের সংখ্যাও কম নয়। তাঁদের অনবদ্য খেদমত থেকে মাত্র অল্প কিছু মণিমুক্তার ন্যায় স্মরণীয় উক্তি উপস্থাপন করা হলো, যা আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন ও দ্বীন প্রচারে উৎসাহ যোগাবে। সকলের নিকট উদাত্ত আহ্বান থাকবে তাঁদের জীবনদর্শন অনুধানে এ মহান ব্যক্তিদ্বয়ের বই-পুস্তক বেশি বেশি পাঠ করার।

পরিশেষে, তাঁদের জন্য আল্লাহর দরবারে আমাদের আরজ, হে আল্লাহ্! আপনি তাদের খেদমতগুলো কবুল করুন ও আখেরাতী মর্যাদার সর্বোচ্চ স্থান দান করুন এবং আমাদেরও তাঁদের মতো করে ইসলাম প্রচারে অবদান রাখার তাওফীক প্রদান করুন। আমীন!

স্মৃতিতে এক আলোকবর্তিকা: প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামছুর রহমান

মো.আরিফুর রহমান

প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামছুর রহমান ছিলেন ইসলামী সাহিত্যের আকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীস চর্চায় অগ্রগামী। বাংলাভাষী মুসলমানদের এক মহামূল্যবান সম্পদ। তরুণদের জন্য এক অনুকরণীয় আদর্শ। সাংগঠনিক নেতৃত্বের একজন মডেল। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের অন্যতম প্রাণপুরুষ। একজন কিংবদন্তী শিক্ষক।

জীবনী: ক্ষণজন্মা এই মনীষী যশোরের কেশবপুর উপজেলার বায়সা (নূরপুর) গ্রামে ১৯৪৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী ইসমাঈল মোড়ল এবং মাতার নাম কুলসুম বেগম। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন ছোটো। তাঁর ৪ জন বোনও ছিলেন। তাঁর এক ভাই এবং দুই বোন এখনও জীবিত রয়েছেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন চার ছেলে সন্তানের জনক।

শামছুর রহমান ছিলেন তুখোড় মেধাবী ছাত্র। তিনি শিক্ষাজীবনের পুরোটা সময় সরকারি বৃত্তি পেয়েছেন। লেখাপড়া জীবনে কয়েকবার স্বর্ণপদক পেয়েছেন। মানুষের মাঝে সেই ছাত্রজীবন থেকে ইসলামের সৌন্দর্য কলমের মাধ্যমে তুলে ধরতে শুরু করেন এই প্রথিতযশা লেখক। নিয়মিত ডায়েরিও লিখতেন বহুগ্রন্থ প্রণেতা এই মানুষটি। শামছুর রহমান আমার নানার ছোটো ভাই। আমার ছোটো নানা। তাঁকে নিয়ে প্রবন্ধে আমি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করলেও সেটা সামগ্রিকভাবে তাঁর জীবনের অনেক কিছু প্রতিফলিত করবে। এই প্রবন্ধ পাঠ করে পাঠকবৃন্দ তাঁর চিন্তা-চেতনা কেমন ছিলো, পারিবারিক জীবনে ও দাঈ ইলাল্লাহ হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন সেসম্পর্কে একটা ধারণা পাবেন। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসে তার যে খেদমত সেটা নিয়ে আমি গুছিয়ে লিখতে না পারলেও এই লেখায় এমন কিছু দিক আছে, যা সবার জন্য অনুপ্রেরণার হবে বলে বিশ্বাস করি। তিনি ছিলেন বিনয়ী, ভদ্র, আপাদমস্তক ভালো একজন মানুষ! ছিলেন দয়াদ্র হৃদয়ের। একদিনও মাদরাসায় পড়েননি অথচ হাল আমলের মাদরাসাপড়া অনেক আলেমকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পাঠ দিতে সক্ষম ছিলেন। ধর্মপ্রাণ অথচ তার মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা ছিল না। মনে-প্রাণে একজন লেখক ছিলেন তিনি। ভাষা নিয়ে তত্ত্ব সৃষ্টি করতেন, ভাষার ভেলায় ভাসতেন। পরিপূর্ণ মুসলিম সাহিত্যিক অথচ সেই প্রবীণ বয়সেও শরৎ, সুকান্ত, নজরুল, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, কবি জসীম উদ্দীন, ডাক্তার লুৎফর রহমান, মুনসী মেহেরুল্লাহ, মধুসূধন কাব্য তাঁর নখদর্পনে থাকত। প্রফেসর শামছুর রহমান ছিলেন একজন গবেষক। সৌদি সরকারের রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসাবে হজ্জব্রত পালন করেছিলেন ১৯৯৭ সালে। সে সময় পবিত্র কাবার ইমাম সাহেবের আমন্ত্রণে তাঁর মেহমানদারিত্ব পেয়েছিলেন তিনি।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা, খুলনা আল-মাহাদ আস-সালাফীর পরিচালক, খুলনা বি.এল. সরকারি কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান এবং সর্বশেষ কলারোয়া সরকারি কলেজের প্রিন্সিপাল, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামছুর রহমান

২০২১ সালের ২২ আগস্ট ভোরে খুলনার দৌলতপুরের আড়ংঘাটার বাড়িতে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। যশোরের কেশবপুর উপজেলার বায়সা গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তৃতীয় জানাজা শেষে তাঁকে কবরস্থ করা হয়। তাঁর সালাতে জানাজায় ইমামতি করেন শ্রদ্ধাভাজন বরেণ্য আলেম বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। তাঁর সালাতে জানাজায় আরও উপস্থিত ছিলেন অগণিত ছাত্র, আত্মীয় পরিজন এবং নিজ গ্রামসহ বিভিন্ন গ্রামের প্রিয় মানুষেরা।

ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায় শামছুর রহমান: গ্রামের মানুষের প্রতি প্রফেসর শামছুর রহমানের ছিল অসাধারণ এক টান। কারো ব্যথা কষ্টের কথা শুনলে তিনি বার বার আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতেন। প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন এই মানুষটি। পারিবারিক সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারায় নিজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। অন্যদেরকে একাধিক বার গুরুত্বসহকারে এ ব্যাপারে নসিহত করেছেন। প্রফেসর শামছুর রহমানের যশোরের কেশবপুরের বাড়িতে এসে যে ঘরটিতে থাকতেন সেই ঘরের দেয়াল আলমারিতে তাঁর একটি পুরাতন ডায়েরি পেলাম। ডায়েরিটি সাদা কাগজ দিয়ে তৈরি। সেলাই করার সময় তার উপর একটি দৃষ্টিনন্দন মলাট লাগিয়েছিলেন। দেখলেই যে কেউ বুঝবেন ওটা তাঁর নিজের হাতে তৈরি। তিনি তাঁর ছাত্র জীবনেই তৈরি করেছিলেন। ডায়েরিতে দেখলাম, সমস্ত মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাঁর দরদ। তিনি খুবই কম কথায় ফুটিয়ে তুলেছেন সেই ডায়েরির কয়েকটি পাতা জুড়ে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়কার লেখা এটি। নানা তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেইসব দিনের কথা তিনি ডায়েরিতে লিখেছিলেন। তার পাতায় পাতায় তিনি সমস্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য মহান আল্লাহ পাকের দরবারে দুআ করেছেন।

যখনই কেশবপুর থেকে নানার দৌলতপুরের আড়ংঘাটায় গিয়েছি দেখতাম, তিনি সফেদা গাছটির নিচে বারান্দায় চেয়ারে বসে লিখছেন। সামনের টেবিলে বিভিন্ন রকম কিতাব খুলে রাখা। তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কিতাব বের করে তথ্য জোগাড় করছেন। নোট করছেন। নিজের লেখার প্রতি দরদি ছিলেন। আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। একবার কেশবপুরে এসেছেন বেশ কিছু দিনের জন্য। আমি তখন ছাত্র। ছুটিতে বাড়িতে আছি। তিনি একটা পাণ্ডুলিপি (সম্ভবত এটা 'আপনি কি জানতে চান প্রকৃত ওলী আওলিয়া কে? আর শির্ক ও বিদআতেও ভেজাল কেন?' এর পাণ্ডুলিপি) দিলেন। বললেন, এটা টাইপ করে সিডিতে সংরক্ষণ করবা। কয়েকদিন লাগলো। কাজ শেষ হলো। বললো কত পৃষ্ঠা হয়েছে? আমি পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করলে তিনি বললেন তোমাদের ভুল হয়েছে। আমার হাতের লেখার ফন্ট সাইজ তো ১২ (অথবা ১৪ বলেছিলেন) তোমাদের কেন এতগুলো পৃষ্ঠা হলো? তোমাদের ভুল আছে। পরে দেখি আমরাই ছোটো বা বড় করে ফেলেছি।

প্রফেসর শামছুর রহমান পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীস অনুসরণে অনড় ছিলেন। অনেক আগের একটা ঘটনা। তিনি তখন গ্রামের বাড়িতে এসেছেন। বায়সা নূরপুর আহলে হাদীস জামে মসজিদে যোহরের সালাত ১:২০ মিনিটে পড়া হতো। যতদূর মনে পড়ছে তখন ছিল শীতকাল। তিনি ০১:১৫ মিনিটে ইমামতি জায়গায় দাঁড়ালেন। তাঁর চাচাতো ভাইয়ের ছেলে বললেন, চাচা এখনো পাঁচ মিনিট বাকী আছে। শামছুর রহমান রেগে গেলেন কিন্তু অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় বললেন, শরীয়ত আমার বাপের নয় যা খুশি তাই করব! তোমরা এত দেরি করে যোহরের সালাত আদায় করো? আওয়াল ওয়াক্তে জামাত হতেই হবে! তিনি খুব অসুস্থ না থাকলে

প্রতিদিন ফজরের সালাতের শেষে মসজিদে বসে সহীহুল বুখারী বা সহীহ্ মুসলিম থেকে হাদীসের গল্প শোনাতেন। আমরা শীতকালের ফজরের সময় পিনপতন নীরবতায় তা উপভোগ করতাম।

গ্রামের মসজিদের পশ্চিম পাশ দিয়ে মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে আসা-যাওয়া করেন। পথটা ভাঙা, হোঁচট খেতে হয়। তিনি নিজের টাকা দিয়ে রাস্তাটিতে ইট বসিয়ে চলাচলের উপযোগী করে দিয়েছেন। সমাজের জন্য এবং ইসলামের খেদমতে তিনি আমৃত্যু কাজ করেছেন। আপনারা অবগত আছেন খুলনার নিজখামার মাদরাসা আল মা'হাদ আস সালাফীর জন্য তার কী পরিমাণ মায়া, দয়া ও ভালোবাসা ছিল! অবসরের পর একটা সময় ওটাই তাঁর বাড়ি ঘর হয়ে গিয়েছিল যেন! পরিবারের কাছ থেকে এই খুলনার মাদরাসা আল মা'হাদ আস সালাফীর উন্নতির জন্য এবং ছাত্রদের জন্য তিনি বছরের পর বছর সময় ব্যয় করেছেন। সহায়তা দিয়েছেন। পরিচিত পরিজন স্বজনদের নিকট টাকা চেয়ে মাদরাসায় দিয়েছেন। আমি দেখেছি তিনি বয়সের ভারে চলতে পারছেন না। কথা বলতে কষ্ট হয় অথচ পরিচিতদের নিকট ফোন করে মাদরাসার জন্য আর্থিক সহায়তা চাচ্ছেন। ইয়াতিম ছেলেমেয়েদের জন্য টাকা চাচ্ছেন। প্রবীণ বয়সে এই জ্ঞানতাপস মানুষটি দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন। মাদরাসার টাকা উঠানোর রশিদবই হাতে খুলনা থেকে যশোরের কেশবপুর আসছেন। নিজের ভাইয়ের ছেলেদের কাছে যাচ্ছেন। টাকা চাচ্ছেন আল্লাহর ওয়াস্তে দেওয়ার জন্য। তিনি বয়সের শেষ প্রান্তে, আমি তখন ছাত্র। আমাকে বলতেন তোমার চাকরি হলে কিন্তু মাদরাসার জন্য বেশি বেশি টাকা দিবা! এই মাদরাসার উন্নতিকল্পে তিনি বেশকিছু সাহসী ও সময়োপযোগী উদ্যোগ এবং পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। বিশেষ করে মাদরাসার গা ঘেঁসে রাস্তার পাশে দোকানঘর নির্মাণ। এই দোকানগুলো থেকে যে ভাড়া আসে সেটা মাদরাসার অন্যতম আয়ের উৎস্য।

এই মানুষটির মন ছিলো ভীষণ নরম। কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন তিনি। আমার মাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। নানার কোনো মেয়ে নেই। অথচ আমাদেরও কখনো বুঝতে দেননি তিনি আমার ছোটো নানা। তিনি তো নানাই! কোনো বর্ষাকালের শেষে নানা আর আমি হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের দক্ষিণ মাঠে যাচ্ছি। নানা বলছেন, এই সেই পথ। আমরা মাঠে আসতাম। তোমার মা তখন অনেক ছোট। আমি কাঁধে করে এই মাঠে নিয়ে আসতাম তোমার মাকে। বাড়ি রেখে আসলে কান্নাকাটি করতো। পরিবারের প্রত্যেককেই তিনি মমতা দিয়ে আগলে রাখতেন। খুলনার দৌলতপুর থেকে যদি শুনেছেন গ্রামের কেউ মারা গেছে তিনি ছুটে চলে আসতেন যশোরের কেশবপুরের গ্রামের বাড়িতে জানাজায় অংশ নিতে। ঠিকমতো হাঁটতে পারছেন না, চলাফেরা সীমাবদ্ধ তারপরও তাঁকে দেখতাম অসুস্থ প্রতিবেশীকে দেখতে চলে এসেছেন। নিজের বোনদের প্রতি তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা লালন করতেন। গ্রামে এসে বোনদের নিয়ে গল্পের আসর জমাতেন। বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নিতেন। আমার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে এমন কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। অহংকার ও অহংকারীদের তিনি ভীষণ অপছন্দ করতেন। তাঁর সাথে দেখা হলে বলতেন, তোমার আব্বা কেমন আছে? তোমার মা কেমন আছে? তোমার চাচারা কেমন আছে? তোমার অমুক চাচার ছেলে অমুক কী করে? তার কয়টা ছেলেমেয়ে? তারা কি ভালো আছে? আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী এবং সমস্ত মানুষের জন্য তাঁর মায়া কাজ করতো। আমার পাড়া-প্রতিবেশীদেরও খোঁজ খবর রাখতেন তিনি।

তিনি হজ্জ করে এসেও কিন্তু ‘হাজী’ বা ‘আলহাজ্জ’ ব্যবহার করেননি! যশোরের কেশবপুর পাবলিক ময়দানের বিশাল ইসলামিক জনসমাবেশে তিনি বলেছিলেন - সালাত আদায় করলে তার নামের আগে কি আমরা ‘মুসল্লি’ অমুক বলি? যাকাত দিলে তার নামের আগে কি ‘মুজাক্কি’ বলি? কালেমা পাঠ করলে তাকে কি ‘আস শাহাদাত’ অমুক বলি? তাহলে হজ্জ করলে কেন ‘আলহাজ্জ’ বলতে হবে?

হজের সময় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল বিশ্ব সাড়াজাগানো রাসুল (সা.) এর জীবনীগ্রন্থ ‘আর রাহীকুল মাখতুম’ (রাবেতা আল-‘আলাম আল-ইসলামী কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় এই বইটি ১,১৮২টা বইয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে) এর লেখক আল্লামা শফিউর রহমান মুবারকপুরীর সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে শফিউর রহমান তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, আপনি কি আমার সদ্য প্রকাশিত ‘আর রাহীকুল মাখতুম’ বইটি পড়েছেন? তখন তাঁর সাথেই বইটি ছিলো। তিনি বইটি দেখিয়ে মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, এই তো সেই বই আমার সাথেই আছে! শফিউর রহমান আনন্দে আবেগে প্রফেসর শামছুর রহমানকে জড়িয়ে ধরলেন। হজ্জব্রত পালন করে এসে তিনি লিখেছিলেন, ‘কতই না মধুর মিলন এই হাজ্ব!’ হজের বিভিন্ন নিয়মকানুন ও প্রাসঙ্গিকতা এই বইয়ে তুলে ধরেছেন তিনি।

কয়েকবছর আগের কথা। প্রফেসর শামছুর রহমান যশোরের কেশবপুরের বায়সা গ্রামের বাড়িতে রয়েছেন। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁর নিকট গেলাম। তাঁর হাতে একটা বই। আর রাহিকুল মাখতুমের ইংরেজি ভার্সন। হাতে আর একটা ইংরেজি পাণ্ডুলিপি। বই এবং ওই পাণ্ডুলিপিতে তিনি দাগাচ্ছেন। কী যেন নোট করছেন! জানতে চাইলাম - নানা, কী করছেন? বললেন, আমাদের আবুল কাশেম মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান জীলানি (তিনি এই লোকটার কথা বার বার বলতেন। তাঁর প্রশংসা করতেন। শামছুর রহমান ছিলেন তাঁর শ্রদ্ধাভাজন। আমি শামছুর রহমানকে তাঁর মঙ্গল কামনা করতে শুনেছি। প্রফেসর শামছুর রহমানের শেষ জীবনে লেখা অধিকাংশ বই জীলানী সাহেব প্রকাশ করেছেন। অনেক বই পুনমুদ্রণ করতে তিনিই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সাহেবের ছেলে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রাসুল (সা.) এর জীবনীর উপর রচনা লিখে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তাই কোথাও কোনো সংশোধন করতে হবে কি না দেখছি (সম্ভবত ওই রচনাটা বই আকারে প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। আমি যদি ভুলে না যাই তবে এই ঘটনাটা জিলানী সাহেবসংশ্লিষ্ট)। তিনি আমাকে বলেছিলেন, জীলানী সাহেব তাঁর বইগুলো পাঠক যেন ওয়েবসাইটে ঢুকেও পড়তে পারে তার একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন। কাজও শুরু করেছিলেন।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. জিনাত হুদা ওয়াহীদা ম্যাডামের অধীনে চতুর্থ বর্ষে রিসার্চ মনোগ্রাফ করছি Ahle Hadith Community and Religious Movement শিরোনামে। এটা কীভাবে শুরু করবো আর কীভাবেই বা শেষ করবো তা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না। ফিল্ডওয়ার্কের কাজে গ্রামে এলাম। প্রফেসর শামছুর রহমান তখন গ্রামের বাড়িতে। তিনি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিলেন। মনোগ্রাফ শেষ করে জমা দিয়ে আশাতীত ভালো ফলাফল করেছিলাম।

২০১৭ সালে নানা অসুস্থ হয়ে শয্যাগত হলেন। নানী নিজে অসুস্থ থাকার পরও নানার জন্য কী পরিমাণ ত্যাগ যে স্বীকার করেছেন, তা বর্ণনাতীত! কখনো নানীকে দেখিনি বিরক্ত হতে। নানাকে দেখতে খুলনার

শামসুদ্দিন সাহেবের জীবনীও উপরিউক্ত দুই জনের জীবনীর সঙ্গে লিখেছিলেন। মাওলানা আব্দুল মান্নান আল আজহারী (র.) সাহেবের জীবনী লিখেছিলেন তিনি। ২০১২ সালে এটি প্রকাশিত হয়। বৃটিশ আমলে মাওলানা আব্দুল মান্নান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ***জামেআ আল আজহারে*** পড়ালেখা করেছেন। মাওলানা আব্দুল মান্নান আল আজহারী (র.) ছিলেন প্রচারবিমুখ মানুষ।

প্রফেসর শামছুর রহমান ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক। একজন ইতিহাসবিদ। একজন শিক্ষক। একজন কবি। (তিনি যে কবিতা লিখতেন এই বিষয়টা অধিকাংশ মানুষ জানে না। ১৯৭১ সালের সেই ভয়াল দিনগুলিতে 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নামে একটি ছোটো কবিতার পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন।) একজন দক্ষ সংগঠক। একজন প্রথিতযশা খতীব। তিনি পবিত্র জুমআর দিনে বা ঈদে খুতবা পেশ করতেন। শ্রোতারা অপলক নয়নে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতেন আর খুতবা শুনতেন। খুতবায় তিনি কুরআন, হাদীস থেকে আলোচনা করতেন। পাশাপাশি সাহাবী (রা.), তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈদের থেকেও উদ্ধৃতি দিতেন। এত সুন্দর করে বক্তব্য রাখতেন যে আমরা তন্ময় হয়ে শুনতাম!

লেখালেখিতে অবদান: ছাত্রজীবন থেকেই প্রফেসর শামছুর রহমানের লেখালেখিতে হাতে খড়ি। সারাজীবন তিনি লিখে গেছেন। অবসর গ্রহণের পর থেকে অসুস্থতা শুরু এই জ্ঞানী মানুষটির। ২০০৫ সালে তাঁর ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয়। তার পরেও অবিরত লিখেছেন তিনি। ছোটো বড়ো দেড় শতাধিক গ্রন্থের লেখক একাধারে লিখেছেন, 'চলার পথের দাবী' 'বিদআত ভয়াবহ', 'কাদিয়ানী ও শিয়া কারা? ভেবে দেখবেন কি?', 'তারুণ্যের চাওয়া পাওয়া', 'ফাতওয়ায়ে আলমগীরের একি আজব ফাতওয়া', 'ইমান বনাম কুফুর, তাওহীদ বনাম শিরক', 'হায়! আমরা যে খুবই কাছাকাছি এসে পড়লাম', 'স্রষ্টার গুণরাজি- সৃষ্টি কৌশল ও প্রকার', 'সৃষ্টির বৈচিত্র্যে মহান স্রষ্টা', 'সঠিক ইতিহাস সত্য কথাই বলে', 'রাষ্টচিন্তা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সুরাতেহাল', 'বিভ্রান্তির অবসর হোক', 'আপন গৃহে অপরিচিত', 'সত্য চির অম্লান', 'ইকরা: ইরশাদ: ইত্তিবা', 'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম', 'সত্যের পথে প্রতিবন্ধকতা', 'হকের মানদণ্ড কি? সত্য গ্রহণে বাধা কি কি', 'বন্দী সমাজ মুক্তি চায়', 'সুবহে সাদিকের আর কত দেরি', 'স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস' এবং 'উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমীয়দের ইতিহাস-এর মতো অসাধারণ সুখপাঠ্য সব বই। সমাজ, ব্যক্তি, ধর্ম, রাজনীতি এবং ইতিহাস সম্পর্কে তিনি নিরলসভাবে লিখে গেছেন।

৬০ বছরের অধিক সময় ধরে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক আরাফাতের' (বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন একটি পত্রিকা) নিয়মিত একজন লেখক ছিলেন তিনি। দৈনিক ইত্তেফাকেরও একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন প্রফেসর শামছুর রহমান। তিনি লিখেছেন 'সাপ্তাহিক জাহানে নও', 'মাসিক তাহযীব', 'দৈনিক ইনকিলাব', 'মাসিক দারুস সালাম', 'মাসিক আল মাদানী' এবং 'মাসিক আহলে হাদীস দর্পণে'ও। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি জাতীয় পত্রিকায় লেখায় অনিয়মিত হয়ে যান কারণ পত্রিকা লেখা বিকৃত করে, যা নানা একেবারে পছন্দ করতেন না। রাজনীতি করেন না অথচ রাজনীতি নিয়ে তাঁর অনেক তত্ত্বপূর্ণ লেখা আছে। রাজনীতি বিষয়েও তাঁর পড়ালেখা ছিল। বিশেষ করে নানা আবুল মুনসুর আহমদের 'ফুড কনফারেন্স' থেকে মাঝে মাঝে আমাকে গল্প শোনাতেন। বর্তমান বাস্তবতার প্রসঙ্গে গল্পগুলো বলতেন।

বাংলা একাডেমির একজন আজীবন সদস্য তিনি। ছোটদের বিশ্বকোষে তাঁর লেখা প্রবন্ধ রয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে তাঁর অনেক লেখা ছাপানো হয়েছে। যাঁর লেখা বই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি ('স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস' ও 'উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমীয়দের ইতিহাস'), বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষ ও লন্ডন, মধ্যপ্রাচ্য থেকেও যাঁর লেখা ছাপানো হয়, অনূদিত হয় আরবি ও ইংরেজি ভাষায়। কিন্তু কোনো অহংকার তাঁর ভেতর আমি দেখিনি। তাঁর মধ্যে ছিলনা টাকা আর বিত্ত বৈভবের বৈষয়িক ভাবনা। একেবারে প্রচারবিমুখ ছিলেন প্রফেসর শামছুর রহমান। সংগঠনের নানান পদ এবং সরকারি চাকুরে হিসাবে বড় বড় দায়িত্ব পালন করেও তিনি কখনো সেটা অহংকারের কোনো বিষয় হিসাবে দেখতেন না।

প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামছুর রহমান তাঁর লেখনির জন্য দেশ ও দেশের বাইরে আহলে হাদীস ও অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য মাজহাবী ভাইদের নিকট থেকে বিপুল শ্রদ্ধা ভক্তি পেয়েছেন। তাঁর রেখে যাওয়া কাজ জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশকে চলমান রাখতে হবে। শুব্বানকেও অলসতা পরিত্যাগ করে লেখনিতে সময় ব্যয় করতে হবে। গবেষণায় সময় দিতে হবে। আমাদের মতো তরুণরাই হতে পারে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি। প্রফেসর শামছুর রহমান নেই এটা সত্যিই আমাদের জন্য বেদনাদায়ক। আমরা একজন বিচক্ষণ অভিভাবক হারিয়েছি। একজন আপাদমস্তক মুমিন, তাকওয়ার অধিকারী ইনসাফকারী মানুষকে হারিয়েছি। আমরা একজন প্রকৃত ভালো মানুষকে হারিয়েছি।

প্রফেসর এ.এইচ. এম. শামছুর রহমানকে নিয়ে গবেষণা হতে পারে। অ্যাকাডেমিক আলোচনা সময়ের দাবী। তাঁর লেখা বই নিয়েও গবেষণা করা প্রয়োজন। অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলো প্রকাশ করা জরুরি। বিভিন্ন সময়ে গল্পে গল্পে মনে হতো তিনি আত্মজীবনী লিখছিলেন। সেখানে বাংলাদেশের অভ্যুদয়, বাংলাদেশে জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং আহলে হাদীসদের অন্যান্য সংগঠন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আভাস দিয়েছিলেন আমাকে। সেটা নিশ্চয়ই আলোর মুখ দেখবে এই প্রত্যাশা করি।

আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন। রহম করুন। তাঁর কবরকে প্রশস্ত করুন। তাঁকে জান্নাতবাসী করুন। আমাদের পরিবারকে এই অপূরণীয় ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আল্লাহ সহায়ক হোন!

লেখক:

প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামছুর রহমান-এর নাতিছেলে।

শুব্বানের অগ্রযাত্রায় মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া

মাহদী হাসান মুহাম্মাদ

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة و السلام على نبينا المعلم والمتبَع، وعلى آله وصحبه أجمعين.

মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া। এদেশের আহলে হাদীস অনুসারীদের হৃদয়ের স্পন্দন, তরুণদের স্বপ্নের ভুবন, অভিভাবকদের আস্থা-নির্ভরতা ও উলামায়ে আহলে হাদীস বাংলাদেশের শিকড়। কবির কবিতা কিংবা সাহিত্যিকের শব্দালংকার অথবা শিল্পীর তুলি এর বিশেষণে আরও সুন্দর কিছু উপস্থাপন করতে পারবে, এ আমার বিশ্বাস। কিন্তু ভাষারাজ্যের এক ইয়াতীম লেখকের হৃদয়ে আবেগের ঝংকার যতটা শক্তিশালী, তা বহিঃপ্রকাশে ততটাই হয়তো দুর্বল ও মিসকীন।

মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, প্রাণপ্রিয় এ শিক্ষাঙ্গনকে আমরা সংক্ষেপে এম এম আরাবীয়া বলে থাকি। স্বাধীন বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত সময়ে তার জন্ম। সেই দুর্ভিক্ষ শুধু অনাহারের দুর্ভিক্ষ নয়, ছিল মৌলিক অধিকার শিক্ষারও দুর্ভিক্ষ; আরও সীমাবদ্ধ করলে বলা যায়, মুসলিমদের আক্বীদা-বিশ্বাসের দুর্ভিক্ষ। হ্যাঁ, সেই সময়ে একদল মুত্তাকী আলেমের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল প্রিয় প্রতিষ্ঠান মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া। এ লেখায় আমি নির্ধারিত একটি দিক তুলে ধরার অভিপ্রায়ে রয়েছি, তাই এর ইতিহাস কিংবা ঐতিহ্য বর্ণনা করে পাঠকের বিরক্তির উদ্রেক করতে চাই না।

উপমহাদেশে বিভিন্ন শতাব্দীতে বহিঃশক্তির অনুপ্রবেশ হয়েছে বারংবার। আর এতে সবচেয়ে বেশি ধরাশায়ী হয়েছে একক স্রষ্টায় বিশ্বাসী মুসলিম জনগণ ও জনপদ। মুসলিমদের বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যেও এই ক্ষতির জলোচ্ছ্বাসে বিশুদ্ধ আক্বীদাহর অনুসারী আহলে হাদীস সমাজই অধিক পরিমাণে বিলীন হয়েছে। বৃটিশ শক্তির দুঃশাসনের অবসান এবং পরবর্তীতে অত্যাচারী শাসকদের করায়ত্ত থেকে মুক্ত হয়ে জন্ম হয় সবুজবীথি এই বাংলাদেশের। লুণ্ঠিত জনপদে অনাহারের হাহাকারের সাথে সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসেও ছিল কুসংস্কার ও অরাজকতার সয়লাব। স্বাধীনতার পূর্বেই এই জনপদের মুসলিমদেরকে সুপথগামী করার প্রয়াসে আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহিমাহুল্লাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস নামক সুসংগঠন। সময়ের পরিক্রমায়, যুব সমাজকে জাতির জন্য গড়ে তোলা ও বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে এই সংগঠন যুবকদের জন্য প্রতিষ্ঠা করে "জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ" নামে তাওহীদী যুব কাফেলা। তাওহীদী কালেমার উপলব্ধি জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে এই সংগঠন। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে আক্বীদা-বিশ্বাস, দাওয়াহ, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ, সংগঠন ব্যবস্থাপনা ও সমাজ সংস্কার; এই পাঁচটি বিষয়ে শুব্বানের রয়েছে সুপরিকল্পিত কর্মসূচি। স্বাধীন বাংলাদেশের মুসলিম সমাজকে সঠিক পথে অটুট রাখার লক্ষ্যে শুব্বানের কর্মসূচিগুলোকে এভাবে প্রকাশ করা যায়; মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাসের সংশোধনে দাওয়াহ'র কাজে আত্মনিয়োগ, এই দাওয়াহ'র

মাধ্যমে সুন্দর সাংগঠনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও সুশিক্ষা-সুপ্রশিক্ষণের প্রসার ঘটানো, যাতে সমাজকে সংস্কারের উপযোগী করে ইনসাফভিত্তিক মানবিক জনপদ গড়ে তোলা সম্ভব হয়; যেখানে মানুষ মানুষের প্রভু হবে না; বরং সকলেই এক আল্লাহর দাসত্ব করবে তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে। এই কর্মসূচি কেবল দুনিয়ায় সুখ-সমৃদ্ধিই নিয়ে আসবে না, সাথে সাথে পরকালীন জীবনেও চির শান্তির জীবন লাভে সহায়ক হবে। এজন্য প্রয়োজন বিপুলসংখ্যক কর্মী ও দাঈ'র। মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবেও একই লক্ষ্যে তার বিদ্যা কাননে গড়ে তোলে বিদ্বান। তাই তো সুযোগ্য অধ্যক্ষ শাইখ মোস্তফা আস-সালাফী ছাত্রদেরকে উপদেশে প্রায়ই বলেন, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

১৯৮৯ সালে শুব্বান কনভেনশনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাই মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার শিক্ষার্থীরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল সবসময়ই। মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার ছাত্ররা শুব্বানের প্রতিষ্ঠাসাল থেকেই এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিজেদের শ্রম, অর্থ ও প্রতিভাকে ব্যয় করেছে। নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও তারা সামনে থেকে ভূমিকা রেখেছে। এই সংগঠনের বিগত কেন্দ্রীয় ৯টি নির্বাচিত কমিটির ৭ জন সভাপতির ৫ জন, ৭ জন সাধারণ সম্পাদকের ৪ জনসহ মজলিসে ক্বারারের অন্যান্য পদে দায়িত্ব পালন করেছেন আরাবীয়ার ছাত্ররা। শুব্বানের সর্বশেষ কেন্দ্রীয় মাজলিসে ক্বারারের ১৪ জন এবং মাজলিসে আমের ৩৫ জন সদস্যই মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার সাবেক ছাত্র। শুব্বানের সাংস্কৃতিক বিভাগ আজ পরিচালিত হচ্ছে শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ নামে; কিন্তু মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার শুব্বান শাখার পরিচালনায় সূচনা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ নামে কার্যক্রম চলমান ছিল। শুব্বানের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে শুব্বান রিসার্চ সেন্টার; যার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখনী ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এর পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন আরাবীয়ান শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী, এরপর শাইখ রেজাউল ইসলাম। দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা শুব্বানের দাওয়াহ'র কার্যক্রম পরিচালনায় স্বতন্ত্র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় আরাবীয়ান ছাত্র শুব্বান সভাপতি শাইখ রেজাউল ইসলামের সুদক্ষ নেতৃত্বে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দাওয়াহ কর্মসূচি ও দুর্যোগে ত্রাণ কর্মসূচিতে ব্যয় হওয়া আর্থিক খাতেও অবদান রেখে চলেছে আরাবীয়ান ভাইয়েরা। যার অন্যতম একটি উদাহরণ- আরাকান থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গা মুসলিমদের ত্রাণ কর্মসূচিতে তাদের সেবা ও অবদান। আরাবীয়ান ছাত্র ভাইদের শুব্বানের সাথে এই সংযোগ উপস্থাপন করার অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য ভাইদের কোনো অবদান নেই। বরং মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার ছাত্ররা শুব্বানের সাথে নিজেদের মেধা, শ্রম ও জীবনের সবকিছু দিয়ে একত্রে পথ চলছে অন্য ভাইদের মতোই আল-হামদুলিল্লাহ।

শুব্বানের সর্বশেষ গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শাইখ ইসহাক এরশাদ মাদানী ও সাধারণ সম্পাদক শাইখ রবিউল ইসলাম হাফিযাহুমাল্লাহর নেতৃত্বে শুব্বান আজ সর্বসাধারণের মনের কোঠায় স্থান করে নিচ্ছে। তাদের এই পথচলায় আরাবীয়ান ছাত্ররা বিভিন্ন দেশ, স্থান, এলাকা ও ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিল।

শুধু একটি কথা উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন মনে করছি। শুব্বানের মহামূল্যবান ইতিহাস বিষয়ক খিদমত "ইসলামের ইতিহাস: উমাইয়া শাসনামল" বইটির অনুবাদ সম্পাদিত হয়েছিল মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার ছাত্রদের মাধ্যমেই। কেবল যে এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাই শুব্বানের সাথে কর্মসূচিতে ভূমিকা রাখছে এমন নয়, বরং মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার পরিচালনা পরিষদ ও শিক্ষকবৃন্দও শুব্বানকে পরম মমতায় আগলে রাখেন। সম্মানিত ওস্তাযবৃন্দ প্রতি বছর আরাবীয়ান বিদায়ী ছাত্রদের উপদেশে এটাও বলেন, "যেখানেই যাও অবশ্যই বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সাথে থাকবে। নিজেদের মেধা, শ্রম ও সময় দিয়ে শুব্বানের সাথে থাকবে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর নেতৃত্ববৃন্দ তোমাদেরকে গড়ে তোলার জন্যই শুব্বানের মতো প্লাটফর্ম গড়ে তুলেছিলেন। তাই তোমরা দাওয়াহ'র এই প্লাটফর্মকে ধরে রাখবে।"

লেখার কলেবর আর দীর্ঘ করব না। মহান আল্লাহর বাণীকে স্মরণ করছি। তিনি বলেন:

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

"যারা ঈমান এনেছে ও ভালো কাজ করেছে তাদেরকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রয়েছে।" [সূরা মায়িদাহ: ৯] মহান আল্লাহর এই আয়াতের একটি সংযোগ এভাবেও করা যায়- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়াসহ দেশের সকল প্রতিষ্ঠানের তরুণ আলেমে দ্বীনরা তাদের কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে পারে। আর তাদের কর্মের জন্য সুন্দর ও সুগঠিত প্লাটফরম শুব্বান।

শুব্বান এদেশের তাওহীদপন্থী যুবসমাজকে সকল অন্যায়-অপরাধ, পাপ কর্ম সম্পাদন থেকে যেভাবে সংরক্ষণ করে; একইভাবে দ্বীনের দাঈ হিসেবে এগিয়ে আসা তরুণ আলেমে দ্বীন ও বিদ্বানদেরকেও বিভিন্ন ধরনের লোভনীয় পঙ্কিলতা থেকে হিফাযতে রাখার প্রচেষ্টা করে। তাই এই যুব কাফেলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা আমাদের সকলের কর্তব্য। এই লেখায় হয়তো উঠে আসল মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার শিক্ষার্থীদের অবদান; অন্য কোনো লেখায় এভাবেই উঠে আসবে অন্যদের কথাগুলো।

পরিশেষে লিখব, বাবা কিংবা পরিবারের প্রতি আমাদের কিশোর মনে অনেক অভিযোগ থাকে। কিন্তু আমরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হই না। একই অবস্থা আমাদের সামাজিক জীবনেরও। আর আমাদের প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসও আমাদের পরিবার। শুব্বান তার অঙ্গ। কখনো কোনো অভিমান, অভিযোগ, অনুযোগে যেন আমরা আমাদের এই পরিবারকে তুচ্ছ না করি, বিচ্ছিন্ন না হই। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনে সকল সৎ কর্ম করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وصلّى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

‘শেসাসের’-এর গোড়াপত্তন ও কিছু কথা

মোঃ আব্দুল হাই

ভূমিকা: সংস্কৃতি হচ্ছে এমন এক প্রাণ, যা বাঁচিয়ে রাখে একটি সমাজ ও রাষ্ট্রকে। আর সুস্থ সংস্কৃতি হলো তার চালিকাশক্তি। অপসংস্কৃতির ভয়াবহ আগ্রাসনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ; বিশেষ করে কিশোর, তরুণ ও যুবশ্রেণি যখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে, ভিনদেশীয় সংস্কৃতির চর্চায় মুসলিম অধ্যুষিত জনপথগুলো যখন ক্ষতবিক্ষত, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে অশ্লীলতাকে আমদানি করা হচ্ছে পণ্য হিসেবে, স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রবোধ হচ্ছে বিলীন এমন সংকটময় মূর্হুতে রুচিসম্মত, পরিশীলিত ও আদর্শিক সমাজ উপহার দেয়ার লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় **‘শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ’** (শেসাস)।

গোড়ার কথা: ছোট্ট চারাগাছের মূল শেকড় থাকে মাটির গভীরে। তাকে কেউ স্মরণ করতে চায় না, তার কথা কেউ বলতেও চায় না সেভাবে। কিন্তু এই শেকড়ই যে গাছের প্রাণ, তাকে অস্বীকার করারও কেউ আছে কি? আড়ালে, গভীরে থেকে খাদ্যের যোগান দিয়ে সেই ছোট্ট চারা গাছটিই একসময় হয়ে উঠে মহীরুহ। সেদিন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয় চারপাশ। কৃতজ্ঞতায় ছুয়ে যায় আবেগী প্রাণ।

আমাদের শেকড়ের ক্ষেত্রেও হয়তো হয়েছে তাই। বিক্ষিপ্ত ইতিহাসের টুকরো টুকরো রসদগুলো দিয়েই সাজানোর চেষ্টা করেছি প্রিয় সংগঠন শেসাসের এক টুকরো ইতিহাস। হয়তো কালের পরিক্রমায় আমরা থাকবো না, কিন্তু ইতিহাসকে স্মরণ করার জন্য রেখে দিতে চাই হৃদয়ের মণিকোঠায়; আগামীর নবীন প্রজন্মের জন্য। তবে চলুন আমাদের অজানা অধ্যায়ের দোড়গোড়ায়।

শুব্বানের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চায় মনোযোগী ছিলো আমাদের পূর্বসূরিরা। আমাদের জানা মতে, **১৯৯৮**-এর মাঝামাঝি কোনো এক সময়। শুব্বানের প্রথম নির্বাচিত সভাপতি প্রিয় সংগঠক অধ্যাপক আসাদুল ইসলাম ভাই তখন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শুব্বানের দায়িত্বশীল। **‘বিশ্ববিদ্যালয়ে’** চলছে বইমেলার আয়োজন। সেখানে নিজস্ব স্বকীয়তাকে বজায় রেখে, নিজেদের সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে পরিচয়ের জন্য প্রয়োজন হলো একটি সুন্দর নামের। অবশেষে আলোচনা, পর্যালোচনা শেষে দায়িত্বশীলদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে তৈরী হলো **“শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ” (শেসাস)**। কার্যক্রম তখনো বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক।

এরপর **১৯৯৯** সালে শুব্বানের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পর ঢাকার মাদরাসাগুলোতে বিশেষ করে **‘মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া’য়** চলছিল শেসাসের কাজ। এছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জেলাতেও শেসাসের কাজ চলমান ছিলো। যেমন, ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত শুব্বানের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে **‘পাবনা জেলা’র** দায়িত্বশীল

ভাইদেরকে শেসাসের নামে সংগীত পরিবেশন করতে দেখা যায়। যদিও সাধারণ্যে এর প্রচার ছিল **'শেকড় শিল্পীগোষ্ঠী'** নামে।

তবে ২০০৩-২০০৮ এই সময়ে কেন্দ্রের অধীনে মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া শাখায় সূচনা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ নামে শেকড়ের কর্মকাণ্ড ভালোই চলছিল। সূত্রমতে, সে সময় বর্তমানে আলোচিত 'হ্যাভেন টিউনস-এর স্বত্ত্বাধিকারী ও বিশিষ্ট শিল্পী গাজী আনাস রওশন আরাবিয়ার শিল্পীদের নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ দিতেন। আর তাতে বর্তমান সহ-সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মিজানুর রহমান (মিজান), কুমিল্লার ভাই মোঃ মুস্তাফিজ ছাড়াও অনেক ছাত্র অংশগ্রহণ করতেন। তথ্যসূত্রে জানা যায়, সে সময় ইসলামী সংগীতের একটি 'এ্যালবাম'ও বের হয়েছিলো সূচনার ব্যানারে। সেসময় শাহবাগস্থ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে শুব্বানের কেন্দ্রীয় ইফতার মাহফিলে সূচনার শিল্পীরা গান পরিবেশন করেছিল। যাহোক, এরপর অনেকটা সময় জুড়েই বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য এই সেক্টরের কার্যক্রমে স্থবিরতা চলে আসে।

সময়ের পরিক্রমায় আসে ২০১৩ সাল। বছরের শেষের দিকে। তখন মিরপুর শুব্বান শাখা সবেমাত্র **'পল্লবী থানা শাখা'য়** উন্নীত হয়েছে। অত্র শাখার একনিষ্ঠ কর্মী হাফেয হাবিবুর রহমান (বর্তমানে মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত) শুব্বানের একটি **'সাংস্কৃতিক শাখা'** গঠনের ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি শাখার দায়িত্বশীলদের নিয়ে ২০১৪ সালের শুরুর দিকে কোনো এক শুক্রবার ছাত্রদের সাথে বৈঠক করেন। আলোচনা শেষে সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে গোড়াপত্তন হলো **'শুব্বান শিল্পীগোষ্ঠী'** নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। হাবিবুর রহমান পরিচালক ও সংগীত পরিচালক হিসাবে মুহাম্মাদ হিদায়াতুল্লাহ-কে সাথে নিয়ে কয়েকজন সদস্যের সমন্বয়ে কাজ শুরু হলো। হাঁটি হাঁটি পা পা করে এভাবেই এগিয়ে চলছিল এর সাংগঠনিক কার্যক্রম। তখনও তারা জানতেন না শুব্বানের সাংস্কৃতিক সংগঠনের শেকড় আরো আগেই প্রোথিত হয়েছে। যাইহোক, 'শুব্বান শিল্পীগোষ্ঠী' প্রথমে ভালোভাবে চললেও আবারো এক সময়ে কার্যক্রমে এলো ধীর গতি।

এভাবেই কেটে গেল দুই বছর। তারপর আসল ২০১৬ সাল। এ সময় এই শাখার সাধারণ সম্পাদক হাফেয আশিক বিন আশরাফ নতুন করে শুব্বান শিল্পীগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ শুরু করেন। সেই লক্ষ্যে ২০১৬ সালের প্রথম দিকেই মাদরাসা দারুস সুন্নাহর অনেক ছাত্র ও দায়িত্বশীল শিক্ষকদের উপস্থিতিতে তিনি একটি সফল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানে উপস্থিত বর্তমান কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাংগঠনিক সম্পাদক তানযীল আহমাদ-এর প্রস্তাবনায় ও সকলের অনুমোদনে **"শুব্বান শিল্পীগোষ্ঠী"** এর নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয় **'শেকড় শিল্পীগোষ্ঠী"**। সেই সাথে একটি নতুন কমিটিও গঠন করা হয়। প্রধান পরিচালক হাফেয আব্দুল মান্নান ও সংগীত পরিচালক হাফেয ওয়াসিম আকরাম ও সহকারী সংগীত পরিচালক শাহিদ হাসান-এর নেতৃত্বে নতুন কমিটি আবার নব উদ্যোমে বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করলো।

চলতে লাগলো সাপ্তাহিক গানের ক্লাস। সে সময় সদস্য ছিলো প্রায় ৪০/৫০জন। শুব্বানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার সুবাদে শিল্পী ও শেকড় পরিচিতি লাভ করতে লাগলো। গান ছাড়াও এ বছর আরো কিছু পদক্ষেপ হাতে নেয়া হলো শেকড়ের জন্য। ইতোমধ্যে কেন্দ্রেও বেশ ভালোই আলোচনা চলছিলো শেকড়কে নিয়ে। এর পর ২০১৭ সাল। এ সময় কেন্দ্রীয় শুব্বানের নির্দেশে **'শেকড় শিল্পীগোষ্ঠী'র** নাম পরিবর্তন করে শুরুর সেই নামই দেয়া হলো **"শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ" (শেসাস)** এবং এটিকে কেন্দ্রীয় শুব্বানের একমাত্র অনুমোদিত সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করা হলো।

প্রাপ্তি ও অর্জন

চাওয়া পাওয়ার হিসাবে খুব বেশি হয়তো প্রাপ্তি নেই আমাদের। কিন্তু একেবারেই যে কিছুই নেই তা ঠিক নয়। দীর্ঘ সময়ে অল্প অল্প করে হলেও প্রাপ্তির জায়গাটা পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তির মধ্যে আছে ২০১৬ সালের ১০ ডিসেম্বর মতিঝিলের একটি কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত শুব্বানের **'৭ম কেন্দ্রীয় সম্মেলনে'** শেকড়ের অংশগ্রহণ। শেকড়ের শিল্পী শাবাব ও সাকিবের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় কিছু সময়ের জন্য হলেও সংগীতের মূর্ছনায় উপস্থিত সকলের হৃদয় জুড়িয়ে যায়। এরপর ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক সংগীতের ক্লাস চালু, শেকড়ের নিজস্ব তহবিল গঠন, পরপর অনেকগুলো গান রেকর্ড হওয়া এগুলোও বা কম কীসে?

এরপর বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পেরিয়ে **১২-০৫-২০১৮** তারিখ রোজ শনিবার শেকড়ের শিল্পীবৃন্দের অংশগ্রহণে হ্যাভেন টিউন স্টুডিওতে চারটি গান রেকর্ড করা হয়। গানগুলো হলো **'রমযান এলো', 'হে যুবক', 'তোমাকে খুঁজেছি আমি'** এবং **শুব্বানের থিম সং**। ২২ মে ২০১৮, মঙ্গলবার শুধুমাত্র 'রমযান এলো' গানটি অডিও রিলিজ করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ। এতোদিন ধরে যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গুণছিলো সবাই সেই স্বপ্ন পূরণ হলো সেদিন। সর্বশেষ দু'মাস পর অর্থাৎ আগস্ট মাসে 'হে যুবক' ও 'তোমাকে খুঁজেছি আমি' এ দু'টি গান ভিডিও রিলিজ করা হয়। এই গানগুলোর মাধ্যমে মোটামুটি ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। আর এগুলোর পিছনে যিনি নিরলস শ্রম, মেধা ও মননশীলতা উপহার দিয়েছেন তিনি হলেন, কেন্দ্রীয় শুব্বানের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সহ-সভাপতি প্রিয় ভাই মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক। মহান আল্লাহ তাকে উত্তম জাযাহ দান করুন, আমীন। এ ছাড়া শেকড়ের উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন হাফেয ইজাবুদ্দীন, হাফেয ওয়াসিম আকরাম, মুহসিন আলম, ওমর ফারুক, হাফেয শাহিন রাজ ও আব্দুল্লাহ মুঈন। এরপর শেকড়ের সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আশিক বিন আশরাফের প্রচেষ্টায় আরো কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয় এবং এর ভিডিও প্রকাশিত হয়। এতে শিল্পীদের তালিকায় নতুন করে যোগ হন যায়েদ, তানভীন খান প্রমুখ।

আর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তির মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে, সারা দেশের বিভিন্ন মাহফিল, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে শেকড়ের সাদর আমন্ত্রণ, শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা, দেশব্যাপী শুব্বানের নিজস্ব সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে শেকড়ের পরিচিতি, বিভিন্ন দিবস, প্রেক্ষাপটে সংগীতের আয়োজন। এছাড়াও

সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনে পদচারণার প্রয়াস। উপরন্তু, একটি মার্জিত, অনুমোদিত পূর্ণাঙ্গ গঠনতন্ত্র এই প্রাপ্তিকে পূর্ণতা দিয়েছে বহুলাংশে।

প্রত্যাশার অতৃপ্ততা

কথায় আছে- প্রাপ্তিটা যখন বাড়ে, প্রত্যাশাটাও বাড়তে থাকে সমান তালে। আমাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই কোনো। মূল সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস এবং অনুরূপ পিতৃ সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসও আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছুই প্রত্যাশা করে। কিন্তু আমরা তাদের কাঙ্ক্ষিত চাওয়াটা হয়তো পূরণ করতে পারি না অনেক ক্ষেত্রেই। নিজেদের অপূর্ণতাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। তবে, প্রত্যাশার অতৃপ্ততার কারণ, কিছু প্রয়োজনীয় চাওয়া পাওয়ার কথা উল্লেখ করা যেতেই পারে। যেমন-

- যেকোনো সংগঠনের মূল চালিকাশক্তিই হলো অর্থ। আর শেকড়ের অধিকাংশ সদস্যই ছাত্র নতুবা অনুল্লেখ্য সাময়িক কোনো কর্মের সাথে জড়িত। এমতাবস্থায়, শুধুমাত্র তাদের মাসিক 'ইয়ানতে'র উপর ভিত্তি করে বড় কোনো প্রোগাম প্রস্তুত করা কষ্টসাধ্য।
- আর দৃশ্যমান কোনো লাভ না থাকায় স্পন্সর পাওয়াটা কঠিন। কারণ, অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের মতো শেকড় ততটা পরিচিত ও প্রসিদ্ধ নয়। আবার এই ধারায় সবাই স্পন্সর হতেও চায় না।
- এছাড়া সংগীত ছাড়া অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক যোগ্য প্রশিক্ষক না পাওয়াটা আমাদের ব্যর্থতা।
- লেখাপড়া বা কর্মস্থানের কারণে অধিকাংশ সদস্য ঢাকার বাইরে অবস্থান করায় প্রায়ই কাজের ব্যঘাত ঘটে।

পূর্ণতার স্বপ: মানুষের চাওয়া পাওয়ার পূর্ণতা নাকি কখনো শেষ হয় না। শুধুমাত্র কবরের মাটিই সব পূর্ণতাকে পূরণ করে দেয়। তবুও আশায় বুক বাঁধাই মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। তেমনি প্রত্যাশার পূর্ণতায় যে স্বপ্ন দেখি বারংবার। কোনো একদিন বাংলাদেশের মাটিতে সুস্থ সংস্কৃতির নেতৃত্ব দেবে **"শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ" (শেসাস)**। হয়তো সেদিন আমরা থাকবো না, নতুন প্রজন্ম নতুন আলোকে সাজাবে তাদের শেকড়কে। শেকড়কে ধারণ করেই নতুন নতুন সাংস্কৃতিক ধারার জন্ম দেবে সেই আলোকিত প্রজন্ম। মহান আল্লাহ্ অবশ্যই আমাদের সৎ প্রচেষ্টাগুলোকে কবুল করবেন, এই আশায় শেষ করছি। **'এগিয়ে এসো শুব্বান, এগিয়ে চলো শুব্বান"**। আল্লাহ হাফেয।

নির্বাহী পরিচালক
শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ (শেসাস)
সেশন-২০২০/২২-২০২১/২৩

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

সাংগঠনিক প্রতিবেদন ৯ম সেশন (এপ্রিল ২০২১-জুলাই ২০২৩)

ভূমিকা: জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর ৯ম সেশনের মজলিসে ক্বারার তথা কার্যনির্বাহী পরিষদ গত ২ এপ্রিল ২০২১ খ্রি. তারিখে গঠিত হয়। ১০ এপ্রিল ২০২১ খ্রি. তারিখে জমঈয়ত ভবনে শুব্বানের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিগত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছ থেকে ২০২১-২০২৩ সেশনের নির্বাচিত ৯ম মজলিসে ক্বারার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। অতঃপর দেশব্যাপী শুব্বানের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য পাঁচদফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করত বিভিন্ন যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এপ্রিল ২০২১ থেকে জুলাই ২০২৩ সেশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ-

১ম দফা কর্মসূচি : ইসলাহুল আক্বীদাহ বা আক্বীদাহ সংশোধন

ইসলাহুল আক্বীদাহ বিষয়ে দেশবরেণ্য ইসলামিক স্কলারদের দিয়ে শুব্বানের ৩য় স্তরের কর্মীদের নিয়ে সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন, বিভিন্ন জেলায় জেলাভিত্তিক আরেফ কর্মশালা আয়োজন, দেশের বিভিন্ন স্থানে জুমআর খুতবার জন্য দা'ঈ টিম প্রেরণ, সাপ্তাহিক ও মাসিক দাওয়াতী প্রোগ্রামগুলোতে আক্বীদাহ্‌বিষয়ক আলোচনা, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আক্বীদাহবিষয়ক প্রচারণাসহ নানামুখী কর্মসূচি ইসলাহুল আক্বীদাহ বা আক্বীদাহ সংশোধন কর্মসূচিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এ ছাড়া শুব্বান রিসার্চ সেন্টার থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত 'আক্বীদাহ্‌ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল' শীর্ষক পুস্তিকাটি বিভিন্ন মহলে আক্বীদাহ্‌ বিশুদ্ধকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

২য় দফা কর্মসূচি : আদ দা'ওয়াহ ওয়াত তাবলীগ বা আহ্বান ও প্রচার

১. কুরআন শিক্ষা কর্মসূচি

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ বিগত চার বছর থেকে মাহে রমাযানে সারা দেশের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে কুরআন শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। ১৪৪২ হি./২০২১ খ্রি. রমাযানে ২৩ টি জেলায় ৩০২ টি কেন্দ্রে সরাসরি ও ১৮ টি কেন্দ্রে অনলাইনে কুরআন শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এতে ৮,৭০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে কুরআন শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। ১৪৪৩ হি./২০২২ খ্রি. রমাযানে ৩১ টি জেলায় ৩৯০ টি কেন্দ্রে সরাসরি কুরআন শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এতে প্রায় নয় হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে কুরআন শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। ১৪৪৪ হি./২০২২ খ্রি. ২৩ টি জেলায় ৩৭৫ টি কেন্দ্রে বাস্তবায়িত হয়। এখানেও সাত হাজার সাধারণ মানুষ কুরআন শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। উল্লেখ্য, এই কর্মসূচিতে বই ও সিলেবাস কেন্দ্রীয় শুব্বানের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের ফ্রি প্রদান করা হয় এবং কেন্দ্র ও জেলা শুব্বানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষকদেরকে সক্ষমতা অনুযায়ী সম্মানীও প্রদান করা হয়।

২. মাসিক আলোচনা সভা

জনসাধারণের মাঝে দ্বীন ইসলামের সঠিক শিক্ষা প্রচারের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে জমঈয়ত ভবনে আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রাহিমাহুল্লাহ মিলনায়তনে মাসিক আলোচনা সভা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়। জমঈয়ত ও শুব্বানে আহলে হাদীসের দায়িত্বশীলবৃন্দ এতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। এ পর্যন্ত মোট ১৮টি আলোচনা সভার আয়োজন করা সম্ভব হয়। বংশাল ও সুরিটোলায় ঢাকা দক্ষিণ জমঈয়তের সাপ্তাহিক প্রোগ্রামে কেন্দ্রীয় শুব্বানের ৩ জন আলোচক আলোচনা করেন। এছাড়াও মোট ১৬ টি সাপ্তাহিক ও তা'লিমী বৈঠকের আয়োজনে কেন্দ্রীয় শুব্বান অংশগ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেন। নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, যশোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জামালপুর, রাজশাহী, দোলেশ্বর ও বগুড়াসহ কয়েকটি জেলায় আম ও খ্বাস সদস্যদগণ এতে অংশগ্রহণ করেন।

৩. অনলাইন আলোচনা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথা ফেসবুক লাইভের মাধ্যমেও কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে ধারাবাহিক আলোচনা প্রচারিত হয়। এ সময়ে প্রায় ৭০টি অনলাইন আলোচনা প্রচারিত হয়েছে। এতে দেশ বিদেশের অনেক বিজ্ঞ ও তরুণ আলোচক বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পেশ করেছেন। ৩২ টি লাইভ প্রশ্নোত্তর পর্ব ফেসবুকে প্রচারিত হয়েছে। উল্লেখ্য, পরবর্তীতে অনলাইন আলোচনার চুম্বকাংশ শুব্বানের ইউটিউব চ্যানেল **Shubban Dawah** তে আপলোড করা হয়েছে।

৪. কেন্দ্রীয় ইফতার মাহফিল

মোট ৩ টি কেন্দ্রীয় ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

১৪৪২ হি./২০২১ খ্রি. রমাযানে জমঈয়ত ভবনে কেন্দ্রীয় ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে জমঈয়ত ও শুব্বানের কর্মীরা ছাড়াও সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন। ইফতারের পূর্বে জমঈয়ত ও শুব্বানের ওলামায়ে কেরাম সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। প্রবাসী জমঈয়তের আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ১২ জন খ্বাস সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন জেলার আয়োজিত ইফতার মাহফিলে খ্বাস সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন।

১৪৪৩ হি./২০২২ খ্রি. রমাযানে জমঈয়ত ভবনে কেন্দ্রীয় ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে জমঈয়ত ও শুব্বানের কর্মীরা ছাড়াও সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন। ইফতারের পূর্বে জমঈয়ত ও শুব্বান ওলামায়ে কেরাম সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। প্রবাসী জমঈয়তের আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ৪ জন খ্বাস সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলার আয়োজিত ইফতার মাহফিলে খ্বাস সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন।

১৪৪৪ হি./২০২৩ খ্রি. রমাযানে মাদরাসা মোহাম্মাদউয়া আরাবিয়ায় কেন্দ্রীয় ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইফতার মাহফিলে দুই শতাধিক সয়েমকে ইফতার পরিবেশন করা হয়। জমঈয়ত ও শুব্বানের কর্মীরা ছাড়াও সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন। ইফতারের পূর্বে জমঈয়ত ও শুব্বান ওলামায়ে কেরাম সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন।

কেন্দ্রের পাশাপাশি জেলা পর্যায়ের ইফতার মাহফিলেও কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন।

৫. দা'ওয়াতী সফর/জুমুআর খুতবা

দাওয়াতী সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন আহলে হাদীস অঞ্চলে এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলায় কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে দাওয়াতী সফরের আয়োজন করা হয়। বিশেষভাবে, জুম'আর খুতবা প্রদানের জন্য এ যাবৎ ৫৫টি টিম প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন জেলায়ও এই কর্মসূচি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়ে আসছে। আর্থিক সহযোগিতা পেলে আরো ব্যাপকভাবে এই কর্মসূচি পালন করা সম্ভব হবে।

এছাড়াও নওগাঁ, টাঙ্গাইল, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, যশোর, রংপুর, দিনাজপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে দাওয়াতী সফর করা হয়।

৬. শুব্বান রিসার্চ সেন্টারের গতি সঞ্চার

গবেষণাভিত্তিক বইপত্র প্রকাশ ও প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয় শুব্বান একটি রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে। ১১ জুন ২০২১ খ্রি. তারিখে ক্বারারের ১৬ জন সদস্যের উপস্থিতিতে কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এতে শুব্বানের সাবেক সভাপতি মোঃ রেজাউল ইসলামকে পরিচালক করে ৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ও ড. এম. এ. বারী রাহিমাহুল্লাহর বইসমূহ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রকাশিত বইসমূহ:

১. 'সিয়ামে রমাযান'- আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ.
২. 'ঈদে কুরবান'- আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ.
৩. ইসলামী অর্থনীতির ক খ - আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ.
৪. 'ঐক্য সংহতি ও জমঈয়ত' - ড. এম. এ. বারী
৫. ফাতাওয়া ও ইজতিহাদ : গুরুত্ব, হুকুম ও শর্ত - অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী
৬. সংগঠন: জমঈয়তে আহলে হাদীস ইসলামী দৃষ্টিকোণ - অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী
৭. মাকতাবাতুশ শুব্বান থেকে 'প্রকৃত সালাফী হোন' নামে একটি অনূদিত পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।

আর্থিক সহযোগিতা পেলে এই বিভাগ থেকে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব।

৭. শেকড়ের কমিটি পুনর্গঠন

১১ জুন ২০২১ খ্রি. তারিখে শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ (শেসাস) এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে তারা তাদের ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করে নিয়মিত ক্লাস ও অনুশীলন করছে। বেশ কয়েকটি জেলায় শেসাস পারফরম্যান্সও করেছে।

৮. বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ

দাওয়াহ ও তাবলীগ বা আহবান ও প্রচারের অংশ হিসেবে গত ২০২২ ও ২০২৩ সালের কেন্দ্রীয় শুব্বান মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ছবিসহ বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছে ও সারাদেশে বিতরণ করেছে।

৯. রমাযানের তুহফা প্রকাশ

দাওয়াহ ও তাবলীগ বা আহবান ও প্রচারের অংশ হিসেবে রমাযান ১৪৪৩ ও ১৪৪৪ হি. কেন্দ্রীয় শুব্বান রমাযানের তুহফা ও লিফলেট প্রকাশ করেছে এবং সারাদেশে বিতরণ করেছে।

১০. জেলা দাওয়াহ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ

বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ইসলামি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এবং আরাফার সিয়াম উপলক্ষে যাত্রাবাড়ি, রংপুর, বগুড়া, ও সিরাজগঞ্জে আলোচনা সভা ও ইফতার প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। আশুরার আলোচনা সভা উপলক্ষ্যেও বগুড়া জেলা আয়োজিত প্রোগ্রামে সভাপতি মহোদয় যোগদান করেন। বংশাল মসজিদে আয়োজিত আশুরার আলোচনায় ক্বারারের কয়েকজন দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন।

৩য় দফা কর্মসূচি : আত তানযীম বা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

১. বৈঠক/সভাঃ

১.১. মজলিসে ক্বারারের বৈঠক

বিগত এপ্রিল ২০২১ খ্রি. থেকে জুলাই ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত মোট **১২** টি পূর্ণাঙ্গ ক্বারার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এবং কোভিড-**১৯** এর কারণে ৫ টি ক্বারার বৈঠক অনলাইন জুম প্লাটফরমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১.২. জরুরি বৈঠক

বিভিন্ন সময় তড়িৎ সিদ্ধান্তের জন্য জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রয়োজনে এ পর্যন্ত প্রায় **১৮**টির অধিক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে বেশকিছু বৈঠক অনলাইন জুম প্লাটফরমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১.৩ মজলিসে আমের বৈঠক

বিগত এপ্রিল ২০২১ খ্রি. থেকে জুলাই ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত ৪ টি মাজলিসে আমের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

২. জেলা কাউন্সিল/ কমিটি গঠন

দেশের সাংগঠনিক জেলাগুলোর মধ্যে মোট ২৪ টি জেলায় শুব্বানের জেলা কমিটি নবায়ন করা হয়। জেলাগুলো- নারায়ণগঞ্জ উত্তর, মেহেরপুর, ঠাকুরগাঁও, নাটোর, সাতক্ষীরা, গাইবান্ধা, মিরপুর, নারায়ণগঞ্জ মহানগর, নওগাঁ জেলা পশ্চিম, রংপুর, জয়পুরহাট, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ, পঞ্চগড়, বগুড়া, কুষ্টিয়া, ঢাকা, মানিকগঞ্জ, পাবনা, শেরপুর, নরসিংদী ও বাগেরহাট।

৩. উপজেলা কমিটি গঠন

১০ টি উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়। সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ), নাটোর সদর, সিরাজগঞ্জ সদর, রায়গঞ্জ, লালমনিরহাটে উপজেলা কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও মাদরাসাতুল হাদীস নাজিরবাজার ও যাত্রাবাড়ি শাখা পুনর্গঠন করা হয়। মাদরাসা দারুল হাদীস সালাফিয়ায় (পাঁচরুখী মাদরাসা) শুব্বানের কমিটি গঠনে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। **উল্লেখ্য, মাদরাসা মোহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায় দীর্ঘ ১৭ বছর পর শুব্বানের শাখা পুনরায় চালু হয়।**

৪. সাংগঠনিক সফর

সারা দেশের বিভিন্ন জেলায় কমিটি গঠন ও নবায়ন, আরেফ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ এবং জেলা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে ৫৭ টির বেশী সাংগঠনিক সফর করা হয়। মজলিসে ক্বারারের সদস্যগণ এসব সফরে অংশ নেন। মজলিসে আমের কয়েকজন সদস্য এবং শুব্বানের সাবেক নিবেদিত ভাইয়েরাও এতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নেন।

৫. কর্মী সম্মেলন

সারা দেশের ৪ টি জেলায় কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৩ সেপ্টেম্বর ২১ তারিখে কুমিল্লা, ১ অক্টোবর ২১ ঢাকা, ২১ নভেম্বর শেরপুর ও ২২ ডিসেম্বর ২১ নরসিংদী জেলায় কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে কেন্দ্রীয় ক্বারারের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

৬. শিক্ষা সফর

সাংগঠনিক কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এবং কর্মীদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে ও তাদের মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেরাইদ শুব্বান কর্তৃক আয়োজিত গত ২ সেপ্টেম্বর ২১ খ্রি. তারিখে নৌকা ভ্রমণে কেন্দ্রীয় মজলিসে ক্বারারের অনেক দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন। সিরাজগঞ্জ জেলা শুব্বান কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষা সফরেও ক্বারারের কয়েকজন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় শুব্বান কর্তৃক আয়োজিত গত ৮ মার্চ ২০২২ তারিখে কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন শিক্ষা সফরে শুব্বান কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৭. জমঈয়তের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ

কেন্দ্রীয় শুব্বান তাদের অভিভাবক সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে। এ পর্যন্ত ২০ টিরও বেশী প্রোগ্রামে জমঈয়তের সাথে কেন্দ্রীয় শুব্বানের অনেকেই অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে মাদরাসা উদ্বোধন, জানাযায় অংশগ্রহণ, ওয়ায মাহফিলে অংশগ্রহণ, সাংগঠনিক বিভিন্ন প্রোগ্রাম, কর্মশালা ও সুধীজনের সাথে সাক্ষাত উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে শুব্বান সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক নিয়মিত উপস্থিত থাকেন।

৮. মতবিনিময় সভা

সালেহ, সালেক, জোন প্রধান, জেলা দায়িত্বশীলদের নিয়ে এবং ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, নাটোর ও টাঙ্গাইল জেলায় সকল স্তরের কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভা (অনলাইন ও অফলাইন) অনুষ্ঠিত হয়।

৯. খতমে বুখারী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগদান

ময়মনসিংহ, এম এম আরাবীয়া, মিরপুর দারুস সুন্নাহ, মাদরাসাতুল হাদীস, দোলেশ্বর মাদরাসা ও দারুল হাদীস সালাফিয়া মাদরাসার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতি মহোদয়সহ কয়েকজন দায়িত্বশীল আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। বিদায়ী ছাত্রদের শুব্বানের পক্ষ থেকে মোট ২৮,৫০০/- টাকার উপহার তুলে দেয়া হয়।

৪র্থ দফা কর্মসূচি : আত তাদরীব ওয়াত তারবিয়াহ বা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ

১. সালেহ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

শুব্বান কর্মীদের সর্বোচ্চ স্তর সালেহদের নিয়ে ২ টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ৩ জুলাই ২০২১ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি. তারিখে আয়োজন করা হয়। দু'টি কর্মশালাই অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২. সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

শুব্বানের ৩য় স্তরের কর্মী 'সালেক'দের নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে ২ টি ও মিরপুর শাখার পক্ষ থেকে ২ টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাগুলো যথাক্রমে, ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি. এবং ২৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে জমঈয়ত ভবনের আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ. মিলনায়তনে ও মিরপুর মাদরাসায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৭০ জন, ২০০ জন ও ৪০ জন। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত ও শুব্বানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, শুব্বানের সাবেক দায়িত্বশীল এবং বিশিষ্ট প্রশিক্ষকবৃন্দ।

৩. আরেফ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মিরপুর শাখায় ৩ টি, ঠাকুরগাঁয়ে ২ টি, ঝিনাইদহে ১ টি, টাঙ্গাইলে ১ টি, নীলফামারীতে ১টি, নওগাঁ পশ্চিমে ১টি, নাটোরে ১টি, কুমিল্লায় ১ টি, নরসিংদিতে ১ টিসহ মোট ১০ টি আরেফ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এসব কর্মশালায় কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

৪. মানোন্নয়ন (সালেহ)

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ, সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা পর্যালোচনা ও সার্বিক পর্যবেক্ষণ শেষে মানোন্নয়ন বোর্ডের সুপারিশক্রমে এই সেশনে মোট ১৯ জনকে সালেহ মানে উন্নীত করা হয়। সালেহদের শপথবাক্য পাঠ করান শুব্বানবিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহেল কাফী আল মাদানী।

৫. অনলাইন বইপাঠ প্রতিযোগিতা

কেন্দ্রীয়ভাবে মোট ২ টি বইপাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে রমাযান ১৪৪৩হি./২০২২ অনলাইন বইপাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ২৩ এপ্রিল পরীক্ষার মাধ্যমে ১ম, ২য়, ৩য়সহ মোট পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ২০জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। গত ১৩ মে ২০২২ শুক্রবার মাসিক আলোচনা সভা ও অনলাইন বইপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ১ম পুরস্কার নগদ ৭,০০০/- (সাত হাজার টাকা), ২য় পুরস্কার নগদ ৬,০০০/-(ছয় হাজার টাকা), ৩য় পুরস্কার নগদ ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার টাকা), এবং এক হাজার টাকার সমমূলের ইসলামিক বই। ৪র্থ থেকে ১০ম পর্যন্ত বিজয়ীকে ১,০০০/- (এক হাজার টাকা) ও পাঁচ শত টাকার সমমূলের ইসলামিক বই এবং বিশেষ পুরস্কার পরবর্তী ১০জনকে পাঁচ শত টাকার সমমূলের ইসলামিক বইসহ সকল বিজয়ীদেরকে সনদ প্রদান করা হয়।

১৪৪৪ হি./২০২৩ খ্রি. রমাযানে দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার মাধ্যমে ১ম, ২য়, ৩য়সহ মোট পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ১০জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। ১ম পুরস্কার ১৫,০০০/-, ২য় পুরস্কার ১০,০০০/-, ৩য় পুরস্কার ৭,০০০/-, ৪র্থ পুরস্কার ৫,০০০/-, ৫ম পুরস্কার ৩,০০০/- ও ৬ষ্ঠ-১০ম পুরস্কার ১,০০০/- এবং ইসলামিক বইসহ লক্ষাধিক টাকার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

৫ম দফা কর্মসূচি : ইসলাহুল মুজতামা বা সমাজ সংস্কার

১. মাস্ক বিতরণ কর্মসূচি

৬ আগস্ট ২০২১ খ্রি. তারিখে যাত্রাবাড়ি সালাফী মসজিদে মাস্ক বিতরণ কর্মসূচি পালিত হয়।

২. রমাযান ফুড প্যাকেজ বিতরণ

দরিদ্র-অসহায়দের মাঝে মোট ৩ বার ফুড প্যাকেজ বিতরণ করা হয়।

১৪৪২ হি./২০২১ খ্রি. রমাযানে সারা দেশের ২৫ টি জেলায় গরীব দুঃস্থদের মাঝে ৪১৬,৪৭০/- (চার লক্ষ ষোল হাজার চার শত সত্তর টাকার) রমাযান ফুড প্যাকেজ বিতরণ করা হয়। ১৪৪৩ হি./২০২২ রমাযানে সারা দেশের ২২ জেলায় গরীব দুঃস্থদের মাঝে ৪১৫,০০০/- (চার লক্ষ পনেরো হাজার টাকার) রমাযান ফুড প্যাকেজ বিতরণ করা হয়। ১৪৪৪ হি./২০২৩ খ্রি. ১৬ টি জেলায় ২৮১,৫০০/- (দুই লক্ষ একাশি হাজার পাঁচশত টাকার) রমাযান ফুড প্যাকেজ বিতরণ করা হয়। অর্থাৎ বিগত সেশনে মোট ১,১১২,৯৭০ (এগার লক্ষ বার হাজার নয়শত সত্তর টাকার) রমাযান ফুড প্যাকেজ বিতরণ করা হয়। বিতরণ কাজে দফতর সম্পাদক সার্বিক সগযোগিতা করেন।

৩. ইয়াতীম ও বিধবাদেরকে সহায়তা

৩৭ জন ইয়াতীম ও ৫ জন বিধবাকে দুই ধাপে মোট ৪২,৫৩৫/- (বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত পয়ত্রিশ টাকা মাত্র) সহায়তা প্রদান করা হয়। এ বাবদ আয় হয় ২২,০০০/- (বাইশ হাজার টাকা মাত্র)।

৪. শীতবস্ত্র বিতরণ

২০২১ সালে ১ম ধাপে উত্তরবঙ্গের ১৯ টি জেলার অসহায় দুঃস্থদের মাঝে শীতকালে সর্বমোট ২৪১,০৪০/- (দুই লক্ষ একচল্লিশ হাজার চল্লিশ টাকা মাত্র) টাকার শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। ২০২২ সালে ২য় ধাপে ২০ টি জেলায় মোট ৩৮৩,৬৭০ (তিন লক্ষ তিরাশি হাজার ছয় শত সত্তর টাকার) শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। বিতরণ কাজে ছাত্র ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

৫. ওযুখানা নির্মাণ

সিরাজগঞ্জের মহিষামুড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদে ওযুখানা নির্মাণ বাবদ ৪৩,০৪০/- (তিতাল্লিশ হাজার চল্লিশ মাত্র) টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়াও বাগেরহাট, কুষ্টিয়া, নড়াইল, বরগুনা, খুলনা ও সিরাজগঞ্জে ওযুখানা, মাসজিদ ও মাদরাসায় ১৭৩,৪০০/- (এক লক্ষ তিহাত্তর হাজার চারশত টাকা মাত্র) অনুদান দেয়া হয়।

৬. ঘুর্ণিঝড় ও বন্যার্তদের ত্রাণ বিতরণ

দেশের উত্তরবঙ্গের ৬ টি জেলার অসহায় দুঃস্থদের মাঝে শাড়ি, কাপড়, লুঙ্গি এবং ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয় এবং সিলেট, সুনামগঞ্জ, রংপুর, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, ও জামালপুরে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বাবদ তিন ধাপে ৭,৪০,০০০/- (সাতলক্ষ চল্লিশ হাজার মাত্র) টাকা প্রদান করা হয়। বিতরণ কাজে জমঈয়ত ও শুব্বান সমন্বিত ভূমিকা পালন করেন।

৭. এককালীন অনুদান

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অসুস্থ, দুঃস্থ ও নওমুসলিমকে **১৮১,২৬০/-** (এক লক্ষ একাশি হাজার দুইশত ষাট মাত্র) টাকা এককালীন প্রদান করা হয়। এছাড়াও আরাকানের মুহাজির মুসলিমদের ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার মাত্র) টাকা অনুদান দেয়া হয়।

৮. টিউবওয়েল প্রদান

রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার অসহায় দুঃস্থদের মাঝে **২**টি টিউবওয়েল প্রদান করা হয়।

৯. কুরবানি কর্মসূচি অনুষ্ঠান ও দুঃস্থ-অসহায়দের মাঝে গোশত বিতরণ

১৪৪৩হি./২০২১ খ্রি. যিলহাজ্ব মাসে কুরবানির পশু ক্রয়ের জন্য বগুড়া, রংপুর, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী ও নওগাঁ জেলায় ৭ টি গরু ক্রয় বাবদ ৪,৩০,০০০/- (চার লক্ষ ত্রিশ হাজার মাত্র) টাকা ও চাঁপাইনবানগঞ্জ জেলায় **২**টি ছাগল ক্রয় বাবদ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার মাত্র) টাকাসহ সর্বমোট ৪,৫৫,০০০/- (চার লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার মাত্র) টাকার আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। এ কর্মসূচিতেও শুব্বানের নিজস্ব তহবিলের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য।

১৪৪৪ হি./২০২২ খ্রি. সালে যিলহাজ্ব মাসে কুরবানির পশু ক্রয়ের জন্য বগুড়া, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও সিরাজগঞ্জ জেলায় **৪**টি গরু ক্রয় বাবদ ২,২০,০০০/- (দুইলক্ষ বিশ হাজার মাত্র) টাকা। চাঁপাইনবানগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও ও নওগাঁ জেলায় **৩**টি ছাগল ক্রয় বাবদ ৪৫,০০০/- (পয়তাল্লিশ হাজার মাত্র) টাকাসহ সর্বমোট ২,৬৫,০০০/- (দুইলক্ষ পয়ষট্টি হাজার মাত্র) টাকার আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচিতেও শুব্বানের নিজস্ব তহবিল থেকে সহযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য।

১০. আশ শিফা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ চালু

গত ৯ ও ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত জমঈয়তে আহলে হাদীসের মহাসম্মেলনে শুব্বানের সামাজিক সেবার অংশ হিসেবে **আশ শিফা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র** আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। তবে আর্থিক সহযোগিতা পেলে এই উদ্যোগ বেশ ফলপ্রসূ হবে।

সু-খবর! সু-খবর!! সু-খবর!!!

হজ্জ ও ওমরাহ্ বুকিং চলছে-২৩-২৪-২৫-২৬

চলতি ওমরাহ্ প্যাকেজ-এ (১৫দিন)

সাশ্রয়ী মূল্যে : ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা (সম্ভাব্য)

মক্কার হোটেলের দুরত্ব : ৪০০-৫০০ মিটার

মদিনা হোটেলের দুরত্ব : ৩০০-৪০০ মিটার

তিন বেলা বাংলা খাবারের ব্যবস্থা থাকবে।

মক্কা-মদিনার দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারা।

বিমান যাতায়াত (সরাসরি) ঢাকা থেকে জেদ্দা।

চলতি ওমরাহ্ প্যাকেজ-বি (১৫দিন)

সাশ্রয়ী মূল্যে : ১,৩৫,০০০/- (এক লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার টাকা। (সম্ভাব্য)

মক্কার হোটেলের দুরত্ব : ৬০০-৭০০ মিটার

মদিনা হোটেলের দুরত্ব : ৪০০-৫০০ মিটার

তিন বেলা বাংলা খাবারের ব্যবস্থা থাকবে।

মক্কা-মদিনার দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারা।

বিমান যাতায়াত (ট্রানজিট)

বি: দ্রঃ রমাজান মাসের বিশেষ প্যাকেজ ওমরাসহ ইতেকাফের সু-ব্যবস্থা এছাড়াও মিশরসহ অন্যান্য দেশ ভ্রমণের সুযোগ (আলোচনা সাপেক্ষে)

➤ ২০২৪-২৫-২৬ ইং সালের জন্য ৩০৭৫২ টাকার মাধ্যমে হজ্জের প্রাক নিবন্ধন চলছে।

শাইখ আব্দুল গফুর আল-মাদানী স্বত্বাধিকারী-

আল-মাদানী হজ্জ ট্রাভেলস্ এন্ড ট্যুরস্

মুনাজ্জেম আহনাফ ট্রাভেলস্ এন্ড ট্যুরস-হজ্জ লাইসেন্স-৫৮৬

ও সেক্রেটারী বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস গোদাগাড়ী উপজেলা শাখা, রাজশাহী।

অফিসঃ ডাইংপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদ সংলগ্ন, আলাউদ্দীন মার্কেট (২য় তলা), গোদাগাড়ী পৌরসভা, রাজশাহী।

ঢাকা অফিসঃ বায়তুল খায়ের, লিফ্ট-১১, ৪৮/এ-বি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

মোবাঃ ০১৭১২-৯৭৪৫৬২, ০১৯৭৭-৯৭৪৫৬২, E-mail: almadanihajj075@gmail.com

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য সাভার পৌরসভার প্রাণকেন্দ্রে
আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষালয়

মাদরাসাতুল হাসানাহ

MADRASATUL HASANAH مدرسة الحسنة

নিয়মিত একাডেমিক প্রোগ্রাম

- ✓ তাহফীজুল কুরআনঃ
  - মক্তব
  - নাজেরা
  - হিফজ
- ✓ ইসলামী শিক্ষা বিভাগঃ
  - হিফজসহ প্লে – ৭ম শ্রেণি (ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়)

উন্মুক্ত গণশিক্ষা প্রোগ্রাম

- ✓ আধুনিক ভাষা শিক্ষা কোর্স (আরবী, ইংরেজি)
- ✓ ইসলামী শরীয়াহ বিষয়ভিত্তিক কোর্স
- ✓ কুরআন শিক্ষা কোর্স
- ✓ দারসুল কুরআন / হাদীস প্রোগ্রাম
- ✓ **Professional Training Program**

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ✓ আলিয়া ও ক্বওমীর সমন্বিত সিলেবাস। IELTS অনুসরণে ইংরেজি এবং আরবী পাঠদান।
- ✓ বালক-বালিকা আলাদা শিফট ও বালিকা শাখায় মহিলা শিক্ষিকা / হাফেজা।
- ✓ বালক-বালিকার জন্য পৃথক আবাসিক এবং ডে-কেয়ার ব্যবস্থা।
- ✓ আধুনিক ভবনে পরিচ্ছন্ন আবাসন ও পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা।
- ✓ CCTV সহ দক্ষ কেয়ারটেকারের তত্ত্বাবধানে পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
- ✓ Multimedia Projector সমৃদ্ধ ক্লাসরুম। IPS সহ সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।
- ✓ প্লে-গ্রুপ থেকে সকল পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষিত, দক্ষ এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকা।
- ✓ NCTB এর পাশাপাশি ইংরেজির জন্য Oxford, Cambridge এর এবং আরবীর জন্য Islamic University Madinah, Ummul Qura University এর বই অনুসরণ।
- ✓ সালাতসহ দৈনন্দিন আমল, যিকর-আযকার, আদব-আখলাক ইত্যাদির অনুশীলন।
- ✓ শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ ও সুস্থতার জন্য Creative arts, Cultural activities, Sports, Study tour ইত্যাদি প্রোগ্রাম আয়োজন।

ভর্তি চলছে

পরিচালক ও অধ্যক্ষ
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম
সাবেক শিক্ষক, কিং খালিদ বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।

+88 01894762337, +88 01973936173
বি-৯৭, বাজার রোড, সাভার, ঢাকা- ১৩৪০।
https://madrasatulhasanah.com
/madrasatulhasanah

Design & Printed by: pixel GRAPHICS & PRINTERS 01757672696